

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের স্মরণে

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityanand Baba Ashram

১৩৯৭

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী স্মরণে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯৯০

শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম

কলিকাতা-৩৫

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭

বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

এবং

ভিক্ষা— পনের টাকা

মুদ্রক : সোম প্রিন্টার্স, ৭, কানাইলাল চ্যাটার্জী স্ট্রীট, দক্ষিণেশ্বর, কলি-৭৬, ফোন : ৫৮-২২৮৮

সূচীপত্র

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের স্বহস্তলিখিত গীতাপ্রশস্তি

হরিকথারসকোবিদ দর্শনালোকে কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী —শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী ১

আমাদের কেদারদা —শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫

পরমভাগবত শ্রদ্ধেয় আচার্য্যের মহাপ্রয়াণে —বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক ৬

রঘুনাথের চোখে কেদারনাথ —শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী ৭

একে একে নিভিছে দেউটি —শ্রীনিমাইচাঁদ গোস্বামী ৯

আর হবার নয় —শ্রীদিলীপ কুমার গোস্বামী ১১

শ্রদ্ধাঞ্জলি —ডঃ অবধ বিহারীলাল কপূর ১২

৺ঠাকুর রসে বশে ছিলেন —শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১৩

দেরী হয়ে গেল —ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী (আদ্যাপীঠ) ১৪

Dedicated to : Our Revered Gurudeb —রাধিকা মোহন সিংহরায় ১৬

শ্রদ্ধাস্পদ কেদারনাথ রায়ের স্মৃতিচারণ — শ্রীধ্রুব নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭

মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি — গুরুরাজ কিশোর গোস্বামী ১৮

চিঠি — স্বাস্থ্যসচিব লীনা চক্রবর্ত্তী ১৯

পরম ভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর মহাপ্রয়াণে —স্বামী অমলানন্দ (রামকৃষ্ণ মিশন) ২০

শ্রদ্ধাঞ্জলি —ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বর ভাই (আদ্যাপীঠ) ২০

স্মৃতিপূজা —অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১

কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ স্মরণে —দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম ২৭

ভক্তির পরিমণ্ডলে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক —শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার ৩১

প্রথম সাক্ষাতে উপলব্ধি —কণিকা সিংহ ৩৩

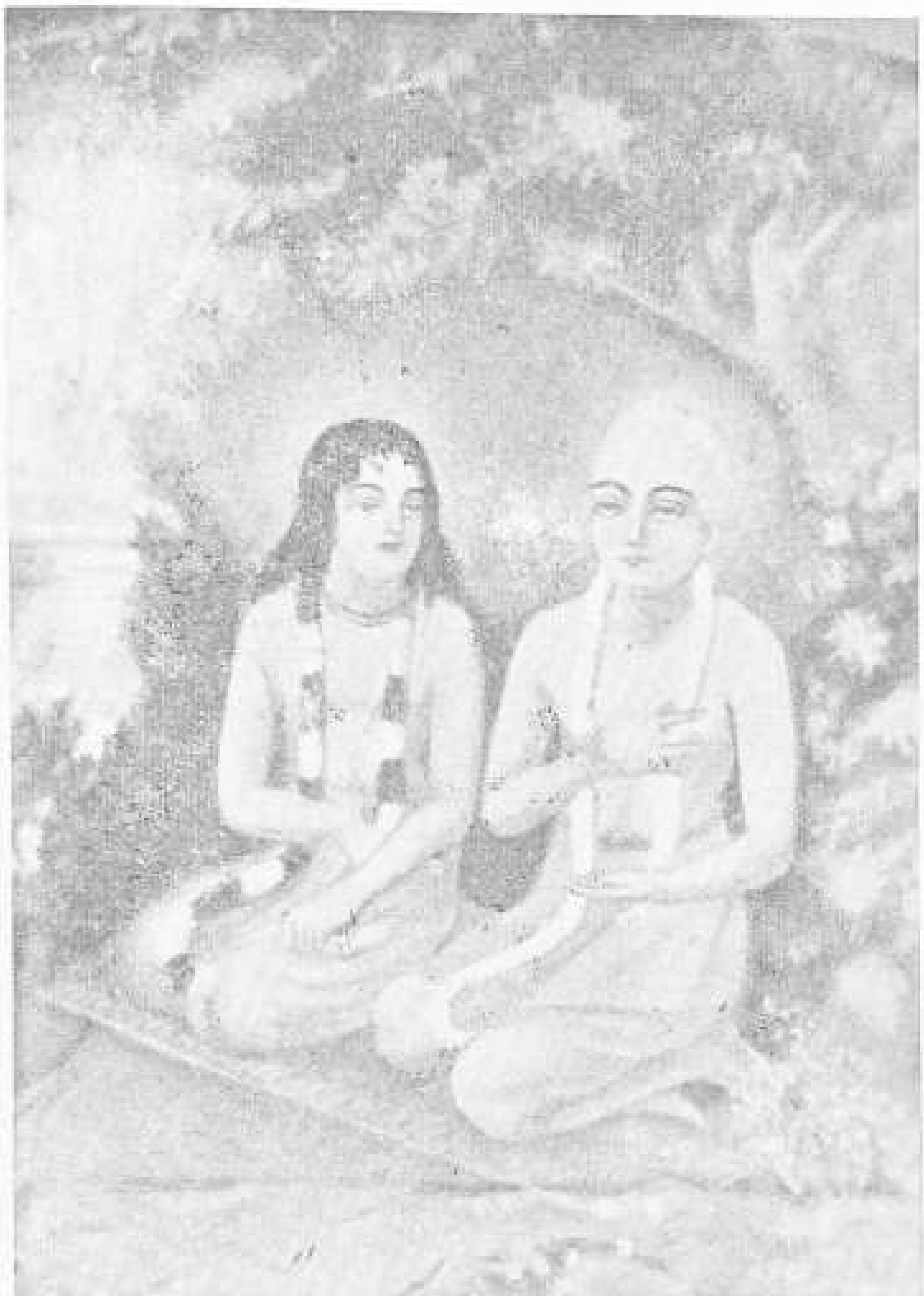
স্মৃতিচারণ —নীহার দাস ব্যাকরণতীর্থ ৩৪

শ্রীল কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের গুণগাথা কথা	—হরিচরণ দাস বাবাজী	৩৬
	—পণ্ডিত হিমাংশু চক্রবর্ত্তী	৩৭
শ্রদ্ধাঞ্জলি		
আমাদের অধ্যাপক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ স্মরণে	—শ্রীহরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৩৮
	—শান্তি	৪০
শ্রদ্ধাঞ্জলি	—শ্রীশুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত	৪১
চিরজীবী হউন	—ডঃ শান্তিরাণী মঙ্গল	৪২
যাহ ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে	—ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা	৪৫
শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ স্মরণে	—শ্রীহেমাঙ্গ প্রসাদ দাস	৪৬
কৃষ্ণানন্দ দাস স্মরণে বিরহ উচ্ছ্বাস		
শ্রীল শ্রীমদ্ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহোদয় স্মরণে	—শ্রীসুধীর কুমার দাশ —শ্রীসুরেন্দ্র মোহন দাশ —শ্রীপঞ্চানন সাহা	৪৭
আমার দাদা	—হৃদয়ানন্দ দাস	৪৯
জিহ্বা যতক্ষণ নড়ে	—কৃষ্ণচৈতন্য দাস	৫১
ভাগবত রসামোদী শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাসজী	—হরিচরণ দাস (পাঠক)	৫২
আমার শ্রীগুরুদেব	—পরিতোষ পাল	৫৩
পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কেদারদার শ্রীমুখে	—শ্রীবিনয় কিশোর গোস্বামী	৫৫
শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্	—রমানন্দ রায়	৫৭
বিরহ উৎসব	—পরমানন্দ রায়	৫৮
পরমশ্রদ্ধেয় মহাভাগবত কেদারনাথ রায় (কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের) মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি	—ডঃ নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫৯
আমার গুরুদেব	—ডালিয়া ঘোষ	৬০
স্মৃতিস্মারকম্	—শ্রীসুলোচন দাস শাস্ত্রী	৬১
স্মৃতিমন্থন	—শ্রীহরিগোপাল গোস্বামী	৬২

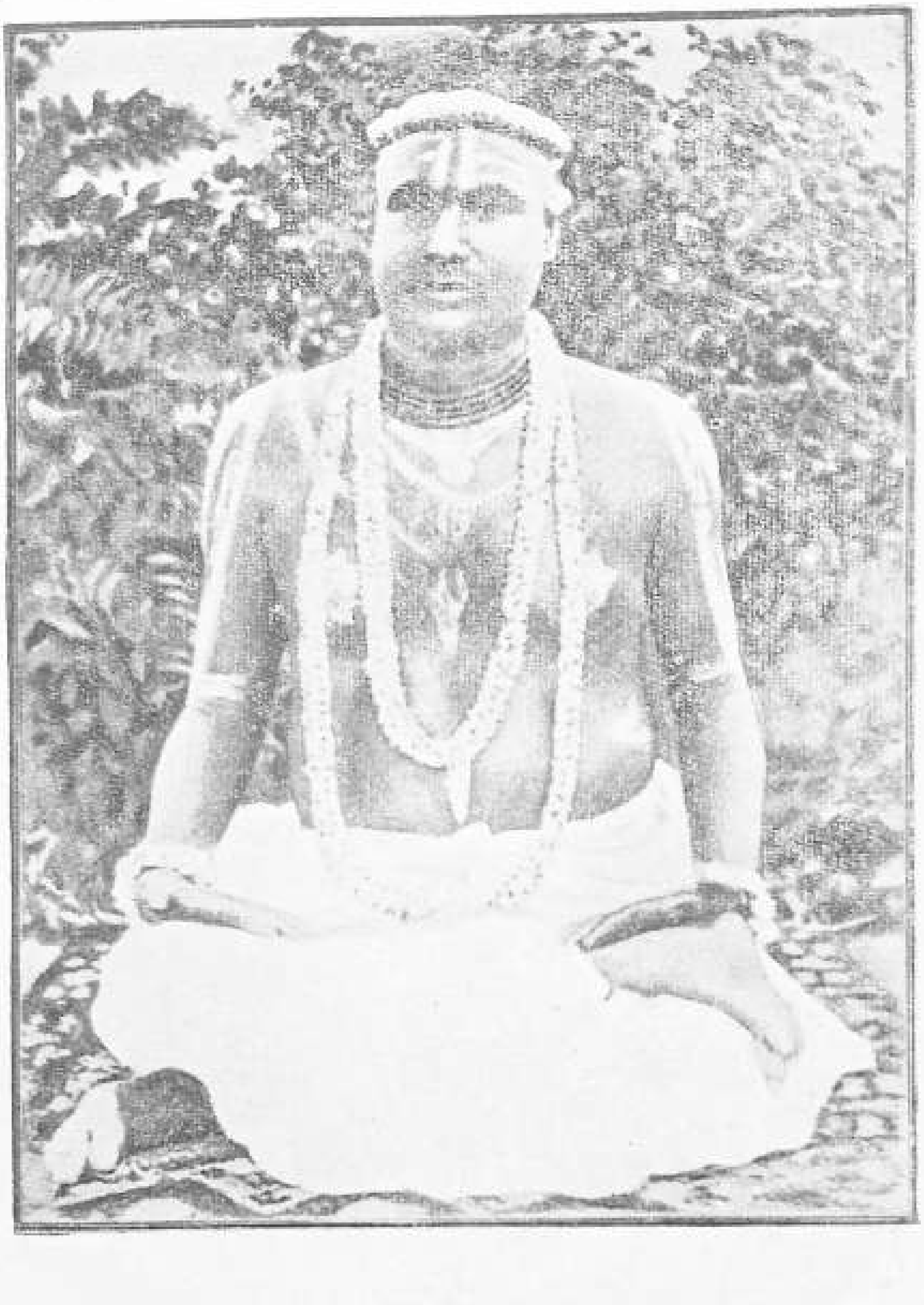
আমার চোখে শ্রীকৃষ্ণানন্দজী	—বিচারপতি মুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায়	৬৪
শ্রীমদ্‌ভাগবতাচার্য্য-পরমপূজনীয়-শ্রীমৎ কেদারনাথ-মহোদয়ানাং মহাপ্রয়াণমুপলক্ষ্য সশ্রদ্ধ-বাক্‌প্রসূনাঞ্জলিঃ	—শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ স্মৃতিরত্ন	৬৫
পরমভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের মহাপ্রয়াণে শোকাঞ্জলি	—শ্রীযোগজীবন গোস্বামী শাস্ত্রী	৬৬
শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থাদি পরিবেশনে সুপণ্ডিত কৃপাময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ বাবাজী স্মরণে	—জনৈক ভক্ত	৬৭
কেদারদা : স্মৃতি ও সুর	—প্রদ্যোত কুমার ভদ্র	৬৮
ভাগবতী কথাকোবিদ কৃষ্ণানন্দ	—ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী	৬৯
চিরস্মরণীয়	—শ্রীবিষ্ণু দাস	৭০
নিবিড় সান্নিধ্যে স্মরণীয় স্মৃতি	—শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী	৭১
স্মরণই ভজন	—শ্রীগণেশ বসাক	৭২
আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতমশায়ের পরমপদকমল প্রণতি জানাই	—গীতা চট্টোপাধ্যায়	৭৩
তব কথামৃতম্	—শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়	৭৬
শ্রদ্ধাঞ্জলি	—শ্রীসমীর মৈত্র	৮৪
শ্রদ্ধাঞ্জলি	—দীপ্তি মুখোপাধ্যায়	৮৫
তত্ত্বদর্শী আমার কেদারদাদা	—শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র	৮৬
স্মৃতিতর্পণ	— ডাঃ বারীণ রায়	৮৯
Guruji	—V. P. Chauhan	৯২
শ্রদ্ধাঞ্জলি	—স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী	৯৩
ভুল সংশোধন	—	৯৪

ভূমিকা

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ পরমপদপ্রাপ্ত হয়েছেন প্রায় ছ'মাসাবধি কাল। সেই পরমপণ্ডিত, পরমভক্ত, শ্রীকৃষ্ণপদাশ্রিত মহামানবের স্মরণোৎসবের কালে এই স্মারণীতে চয়িত হল তাঁরই অন্তরঙ্গ, ভক্তজনের রচনার্ঘ্য। খুবই স্বল্প সময়কালের মধ্যে এই প্রকাশনায় কিছু শৈথিল্য হয়তো থেকেই গেল। সবই মনের মতো হল না। অজস্র লেখা অল্প পরিসরে স্থান করে নিয়েছে : ফলে পরিমার্জনার প্রয়োজন হল। আশা করি রচনাকারগণ এই সম্পাদকীয় স্বাধীনতা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নেবেন। সকলেই তাঁর ভক্ত, সুতরাং সকলের লেখাকেই স্থান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভুল-ত্রুটিও কিঞ্চিৎ থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। ভক্তজনের ভক্তির এই অর্ঘ্য সম্পাদনার সমস্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে না পারলেও, আন্তরিকতার গুণে গৃহীত হবে এই আমাদের আশা।



শ্রীশ্রীনিতাই গৌর।



শ্রীল-শ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহারাজ

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥



শ্রীশ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজ



শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ

জগদ্গুরু শ্রীল ~~প্রভুপাদ~~ নানা মন্দ ~~ব্রহ্মচারী~~ঃ
প্রভুপাদ
গীতা ~~প্রসঙ্গিনী~~ ~~...~~ (গেয়ে সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত ১০৮ শ্রী শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের গীতামাহাত্ম্য ভাষিত। যাহা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি তাহা লিখিতেছি —

গীতা সুধা তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণী, ইহা শ্রদ্ধা দিয়া স্পর্শ করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হয়। শাস্ত্র বলেন — গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥ বিচার করিলে গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত দুইটি গ্রন্থ পরস্পর হইতে উৎকৃষ্ট। তবে এতে গীতা দর্শন আর ভাগবত দর্শনীয় দেখা যায়, অতএব তত্ত্বদর্শনের জন্য গীতা দর্শন, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শনীয়। দুইটি গ্রন্থ তত্ত্বে প্রতি সমান প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু চক্ষু না থাকিলে দর্শনীয় বস্তু দেখা যায় না, চক্ষু থাকিলেও দর্শনীয় যদি না থাকে তাহা চক্ষুও সার্থক হয় না। এখন তবে চক্ষুর ও সার্থকতা গীতা আগে প্রয়োজন, তারপর চক্ষু দুইটি গীতা ... শ্রীমদ্ভাগবতরূপ দর্শনীয় বস্তু প্রয়োজন।

তাই তত্ত্বদর্শনের চক্ষুস্বরূপ গীতা শাস্ত্রের ~~...~~ সকলেরই আছে বিশেষ প্রয়োজন। গীতা প্রভাবের জন্য প্রশংসা সর্বদাই আছে, আমরা শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে শুনেছি

আশ্রম হইতে গীতার অনন্য প্রকাশন দেখিতেছি। সাধ্যমত গীতার প্রশংসা অনেক আছে তার মধ্যে —

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

এই গীতা প্রচারের এই সাধু প্রচেষ্টা সর্ব জীবের পারমার্থিক কল্যাণ সাধন করিবে ইহা সাধু সজ্জনের সিদ্ধান্ত বা অভিমত। ইতি লেখক।

শ্রী রাধাকুণ্ড আশ্রমবাসী
কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী।
মধুসূদন দাস বাবাজী

॥৬ই এপ্রিল, ১৯৯০॥

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের স্বহস্তলিখিত গীতপ্রশস্তি

হরিকথারসকোবিদ
দর্শনালোকে কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী

আমি প্রথম দর্শন করি পূর্বাশ্রমে কেদারনাথ রায় বর্তমানে কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজকে পুরীধামে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দিরে। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল উপাখ্যানে নাম মাহাত্মের কথা প্রসঙ্গে লোমশ মুনির করুণার কথা তিনি পাঠে আস্বাদন করেন। লোমশ মুনির কৃপায় অজামিল-পত্নী কিভাবে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম "নারায়ণ" রাখিলেন— সেই পাঠটি শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিলাম—ইনি কে? শুনিলাম ইনিই হইলেন ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত প্রবক্তা শ্রীল কেদারনাথ রায় কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ, ভাগবতভূষণ। তারপর কলিকাতায়, পুরীধামে ও অন্যান্য ধর্মসম্মেলনে মিলিত হইয়াছি ধর্মকথা আলোচনা সভায়। তাঁর বাচনভঙ্গী এত রসাল মধুর ছিল মনে হতো আরও শুনি। তিনি ব্যাসাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় মঙ্গলাচরণের সময় চোখ দুটি বন্ধ করিতেন আর ভিতরের দিব্যনয়ন খুলিয়া যাইত। তিনি ধ্যানস্থ অবস্থায় অন্তর্জগতের রহস্যময় লীলাসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেন। শ্রোতৃবৃন্দের মনের মণিকোঠায় লীলার নানা রত্ন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেন। আনন্দ-লীন ভক্ত শ্রোতৃমণ্ডলী আকণ্ঠ পান করিতেন শ্রীহরিকথা-শ্রীগৌরনিত্যানন্দকথা আর নাম মহিমা সুধা। শ্রীপাঠবাড়ীতে বৈষ্ণবপ্রাণ শ্রীনিত্যানন্দৈকশরণ মূর্তি শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের শতবর্ষ আবির্ভাব স্মরণোৎসবে শুনিয়াছি গুরুনিষ্ঠ প্রাণের পবিত্র সলিলে স্মৃতিতর্পণ প্রেমাঞ্জলি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মণ্ডলের আয়োজিত ষোড়শ দিবস ব্যাপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসবের চালতাবাগান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত মহতী সভায় ভাষণ প্রদান করেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্তমান শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের মোহান্ত শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী মহারাজ। সেই সভায় শ্রীল কৃষ্ণানন্দদাস বাবাজী মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মণ্ডলের অভিনন্দন পত্রে "পুষ্পাভিবাদনে" বলা হয় "বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনায় স্মৃতি-ধৃতি-মেধা মধু ও প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল আপনার হেমাধার সদৃশ জীবনপাত্রটি ঐশী তৃপ্তির আনন্দ মাধুকরী মধুকর বৃত্তির সফলপ্রয়াস-পদাবলীর প্রস্রবণ মধুধারায় প্রার্থনানতি প্রেমারতির ভগবৎকৃপার পুণ্যরশ্মির বিমলদ্যুতিতে আপনার সমগ্র জীবন সাধনার সৌধ নির্মিত। এই দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যার ফলস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমণ্ডলের পক্ষ হইতে আপনাকে "বৈষ্ণব সাহিত্য শিরোমণি" এই অভিজ্ঞান প্রদান করা হইল।" (৩১/৮/৮৬)

বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ীতে অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মণ্ডলের বৈষ্ণবদর্শন শাখার সভাপতির ভাষণে যে মনোগ্রাহী দর্শনবিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন (১৯৮৮) তাহা আজও শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে

জীবন্ত হইয়া আছে। বার্ণপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব উৎসব সভায় যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাও অনবদ্য ও রসতথ্য-সমৃদ্ধ।

মানবসমাজে আমরা দুই শ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎকার পাইয়া থাকি। একশ্রেণীর মানুষ স্থাবর ধর্মী আর একজাতীয় মানুষ জঙ্গমধর্মী প্রবর্ধনশীল। স্থাবরধর্মী মানুষ আপন স্বার্থকেন্দ্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত একান্তভাবে আপন লাভ লোভ প্রতিষ্ঠা প্রমত্ততা তাঁর স্বভাবধর্ম আর এক শ্রেণীর মানুষ বিস্তারধর্মী বিদ্যাজ্ঞানে ভক্তিসাধনায় শরণাগতির চিত্ততোষিণী বৃত্তিদ্বারা জগতের অন্যান্য মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপ্রেমের জ্ঞানবৈরাগ্যের তৃষ্ণা বর্ধনকারী লোকহিতৈষণার মূর্তি। কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ ছিলেন জঙ্গমধর্মী বিস্তারবিলাসী দৈন্যতার খনি ভাগবত ভাবনার চিত্তচমৎকারী দিব্যরসকথা ব্যাখ্যার সুনিপুণ আনন্দী ধ্যানী সাধকশ্রেষ্ঠ।

তাঁর বাস্তব জীবনবোধের সহিত ভাগবত চেতনার সমন্বয় সাধনরীতি আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে শাস্ত্রানুশীলনে অনুরাগপ্রধান ভজন কৃত্তিতে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সিদ্ধান্ত প্রকাশে ও রস-তত্ত্ববিচার নিপুণতা তাঁর সুমেধার স্বরূপাস্বাদনমুগ্ধতা শ্রবণসাধনপর শ্রোতৃমণ্ডলীকে নিকুঞ্জ ভাবনার কুসুমোদ্যানে প্রবেশে আবেশবিভোরতার প্রাণস্পন্দনে বিমুগ্ধ করিত।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভুযুগলের করুণাকল্লোলিনীর দুরবগাহ মাধুরী আস্বাদনে তাঁর প্রাণ-বিহঙ্গ সর্ব্বদাই লীলাতরঙ্গিণীতে সন্তরণ করিত। তাঁর ভাবসমৃদ্ধ ভাষণাবলী সঙ্কলনে ডক্টর বাসন্তী চৌধুরী, আদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভদ্র ও শ্রীরতন রাহার প্রচেষ্টা স্মরণীয়। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপে আমরা বাবাজী মহারাজের মনন চৈতন্যের চিন্ময় প্রকাশরূপে গোপীগীতের পূর্ব্ব-কথা, দ্বাদশ ভাষণ, ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসরসতত্ত্ব গ্রন্থসমূহে কৃষ্ণানন্দজীর প্রাণ প্রসারতার মাধুর্য্য সম্বেদন—রসগ্রন্থনায় অপূর্বতা মণ্ডিত রসে স্বাদে অনুভব সামর্থ্যে ভক্ত সামাজিকের চিত্তপ্রসন্নতার কারণ ঘটিয়াছে, মঙ্গল প্রেরণাদায়িনীরূপে ভক্তচিত্তে শুচিতা ও ভগবৎকথা নিষ্ঠার দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরণানুগ শ্রীরূপসনাতন রঘুনাথ শ্রীজীবের রসদর্শন অনুশীলনে অক্লান্ত বিরল সেবা-সুনিপুণ মধুব্রতধারিণ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ লৌল্যতার মৌচাক গড়িয়া তুলিয়াছেন। অগণিত ভক্তরসিকসজ্জন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জ্ঞানিভক্ত ভগবদ্‌ময়তার অনুভবিগণের চিত্তশতদলকে বিকশিত করিয়াছেন শ্রীগুরুকৃপা সমাশ্রয়ে সুস্নিগ্ধ মানস বিদগ্ধতার পরিমণ্ডলে।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলন পরিনিষ্ঠিত অন্তর—বৈষ্ণবদর্শনদর্পণে আত্মসাক্ষাৎকারের মহোৎ-সবক্ষেত্রে প্রসারিতধী—ব্যাকরণ অলঙ্কার গ্রন্থাদি চর্চায় মানস ঐশ্বর্য্যের সুউন্নতস্থিতি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী জ্ঞানভক্তির পরাবিদ্যাবৈভবাস্বাদন স্বাহুতা জীবনকে করিয়াছে ভজন দেউলে রূপায়িত।

শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবকে উপদেশ প্রসঙ্গে স্বয়ং শ্রীভগবান বলেন,

অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ—
র্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥ (ভাঃ ১১।১২।২৩)

(গৃহী) কামী মানুষ গ্রামে বিচরণকারী শকুনির ন্যায় অনিত্যবিকারগ্রস্থ পচাগলা মাংস ভক্ষণে দুঃখরূপ ফলভোগে প্রমত্ত আর অরণ্যচারী বিবেকীপুরুষ হংসের ন্যায় সুখরূপ ফলভোগ করেন। শ্রীগুরুকৃপায় পূজনীয় গুণসমৃদ্ধ শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে পরমানন্দময়েরই মায়াশক্তির প্রভাব বিচিত্র প্রকাশ তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া বেদের যথার্থ রহস্য উপলব্ধি করেন।

এই শ্লোকটি প্রয়াণপূর্বদিবসে (২৮।৪।৯০) শনিবার সন্ধ্যায় বিশেষভাবে শ্রীল কৃষ্ণানন্দজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত কথাপ্রসঙ্গে আস্বাদন করেন। প্রীতিনিলয় শ্রীমাধবানন্দ বাবাজীর মুখে এই কথা শ্রবণ করি। শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুরের প্রেমভক্তি—চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসিত আবেশ আতপ্ত অন্তরে এই ভাব পোষণ করিতেন—

প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষার নিধিপ্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিনু উপায়।

এই ভাবমূর্তি ছিলেন শ্রীল কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ। অতুলনীয় শাস্ত্রসম্পদের অধিকার লাভ করিয়াও তিনি ছিলেন দৈন্য ও নিরভিমানিতার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। মদীয় পরমপূজ্য একাধারে পিতৃদেব ও শ্রীগুরুদেব অনন্তশ্রী প্রাণকিশোর গোস্বামী প্রভুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাপ্রীতিসম্ভ্রম সমাদরবুদ্ধি ছিল অসাধারণ। বহু সভায় দু'জনের শ্রীহরিকথায় মিলন চিত্র মানসপটে অঙ্কিত হইয়া আছে। "গীতা জয়ন্তী" সভায় স্বামী সত্যানন্দ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড শতবর্ষব্যাপী শ্রীহরিনামযজ্ঞপীঠে কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের সুদীপ্ত ভাষণে বিমুগ্ধ হইয়া পিতৃদেব প্রভু প্রাণকিশোর সভাস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর উল্লসিত হরিধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে ''ভাগবতভূষণ'' অভিজ্ঞান প্রদান করেন।

স্মৃতিশক্তি-লাবণ্য মুক্তার ন্যায় ভাষণমুখে দ্যুতি বিকীর্ণ করিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর শ্রবণ-গহনে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে আমরা লক্ষ্য করি—

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥

(ভাঃ ১১।১৪।১৭)

যে সকল নিষ্কিঞ্চন, শান্ত, নিরভিমান, ভূতবৎসল, বিষয়রাগস্পর্শশূন্য পুরুষ আমার প্রতি একান্তচিত্ত হইয়া সেবাপরায়ণ তাঁহারাই নিরপেক্ষ জনলভ্য পরমসুখলাভ করিয়া থাকেন, অন্য কেহ তাহা লাভ করে না।

কৃষ্ণানন্দদাস বাবাজী মহারাজ ছিলেন এই সদ্‌গুণরাজি আদর্শ অনুসরণের মূর্তিমন্ত প্রকাশ।

পণ্ডিতবর্য্য বৈষ্ণবচরণ দাস তর্কতীর্থ ও রসপণ্ডিত কৃষ্ণানন্দদাস বাবাজী মহাশয় (কেদার নাথ রায়) কাব্যব্যাকরণ পুরাণতীর্থ মহোদয়দ্বয় তত্ত্বে ও রসানুশীলনে সুনিপুণ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে দ্বৈতানুভূতির রসের সেতু তৈরী হইয়াছিল। শ্রীশ্রী কৃষ্ণের রাস রস-তত্ত্ব ব্যাখায় চিত্রকেতুর উপাখ্যান প্রসঙ্গে বলেন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক কথায়—

যথা পণ্যানি দ্রব্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ।
পর্য্যটন্তি নরদেবং জীবো যোনিষু যোনিষু॥

যেমন দোকানীর পণ্য, দ্রব্যাদি, স্বর্ণ প্রভৃতি বিক্রয়ে তার সত্তাচ্যুত হয় তেমনি মানুষও নানাযোনিতে জন্ম জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

"যাঁরা নারায়ণপরায়ণ তাঁরা কোথাও ভয় পান না। স্বর্গ, অপবর্গ নরক সব জায়গা সমান দর্শন করেন। ভক্তির আস্বাদনের মহিমায় স্বর্গকেও যে চোখে দেখেন, নরককেও সেই চোখে দেখেন। কোন্ চোখে? ত্যাজ্য চোখে, ত্যাজ্য বুদ্ধির চোখে তাঁরা স্বর্গ, অপবর্গ মানে মুক্তি আর নরক সমান দেখেন হরিভক্তির আস্বাদে।"

কৃষ্ণানন্দদাস বাবাজী মহারাজ স্বাভীষ্ট সেবা শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ কৃপা লাভ করুন।

জয় নিতাই। জয় গৌরহরি!

—শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী

আমাদের কেদারদা

বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ নামে যিনি সমধিক পরিচিত সেই আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কেদারদা বিগত ২৯শে এপ্রিল (১৯৯০) তাঁহার সুদীর্ঘকালের পঠন-পাঠন, যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সমাপনান্তে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বিগত দশ বৎসরকাল তাঁহার স্নেহকোমল সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর ভক্তিরস এবং জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমদ্‌ভাগবদ্ পাঠ, সুসমৃদ্ধ পরিবেশনা ভক্তজনের নিকট যে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল তাহা আমি পাঠবাড়ী ছাড়াও অন্যত্র বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার 'সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব' ভক্তবর্গের নিকট ভক্তিরসের উৎস হইয়া আমরণ প্রেরণাস্বরূপ হইয়া থাকিবে। যদিও তিনি ভক্তিরসমার্গের অন্যতম প্রবক্তা তথাপি জ্ঞানের প্রদীপ্ত দীপালোকে তাঁহার স্বচ্ছন্দ অবাধ বিচরণ ছিল। এজন্য ভক্তিরসের প্রাণপুরুষ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে দ্বিধাহীনভাবে জগতের সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন এবং ভক্তিকেই একমাত্র পাথেয় বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

তাঁহার সহিত সময় সময় জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় লক্ষ্য করিয়াছি যে, তত্ত্বের সকল বিষয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের সাবলীল প্রকাশভঙ্গী কত সহজ ও সুন্দর ভাষার মাধুর্যে মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিত! তাঁহার এই আকস্মিক মহাপ্রয়াণে শ্রীপাঠবাড়ী হারাইল এমন একজন মহান অধ্যাপককে যিনি ছিলেন বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বৈষ্ণবধর্মের সুমহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই ক্ষতি বৈষ্ণবজগতে নিঃসন্দেহে অপূরণীয়। তাঁহার ন্যায় একজন নিষ্ঠাবান গবেষক, ভাগবদ্ বিশারদ যিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বটিকে ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়া ভক্তবৈষ্ণবজনের কাছে প্রকাশ করিতেন তাহা হয়তো একালে আর দেখা যাইবে না। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য কাহারও কাছে অবিদিত নাই। তাঁহার 'সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব' পাঠকালে প্রতিটি শ্রোতাই ভক্তিরসের অমৃত ধারায় অবগাহন করিয়া পরম তৃপ্তি ও শান্তিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

তাঁহার সুনিবিড় স্নেহ সান্নিধ্যে আসিতে পারিয়া আমিও নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিয়াছি। তাঁহার নিকট যে শিক্ষা সকলে লাভ করিয়াছেন তাহা নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত ও রূপায়িত করিতে সচেষ্ট হইলে তবেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে বলিয়া মনে করি।

—শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পরীক্ষা নিয়ামক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পরম ভাগবত শ্রদ্ধেয় আচার্য্যের মহাপ্রয়াণে

ভক্ত, ভগবান ও ভাগবত এই তিনে এক। একই ভগবান এই তিনরূপ ধারণ করিয়াছেন। ভক্তই, ভগবান ও ভাগবতের চলমান প্রকটমূর্ত্তি স্বরূপ। ভক্তরূপী ভগীরথই অবতীর্ণ হন বিগলিত করুণারূপিণী ভাগবতী গঙ্গা ও শ্রী ভগবানরূপ মহাবারিধির সাগর সঙ্গমে।

শ্রীমদ্ ভাগবতের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণ পরির্তিত", অর্থাৎ পূর্ণপূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শব্দব্রহ্মরূপে ভাগবতে পরিবর্ত্তিতরূপ। পরম ভক্তই সক্ষম হন ভাগবতের রস আস্বাদন করিয়া এই তত্ত্ব ও রসের পরিবেশন করিতে। ভাগবত পাইয়াই মহর্ষি শুকদেব হইয়াছিলেন পরম ভাগবত পুরুষ—জীবন্ত ও চলন্ত ভাগবত। শুনাইয়াছিলেন পরীক্ষিত মহারাজকে সপ্তাহ-কালব্যাপী এই সুন্দরতম রসমাধুর্য্যে ভরা শ্রবণমঙ্গলকর ভাগবত কথা।

যুগযুগ ধরিয়া ভক্ত আচার্যগণ এই ভাগবত মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। বরাহনগর পাঠবাড়ীতে স্বয়ং গৌরাঙ্গসুন্দর ভাগবত আচার্য্যের নিকট এই রস আস্বাদন করিয়া অবিচারে ও অকাতরে বিলাইয়াছেন ভারতের ঘরে ঘরে। এই ভক্তিধামেই যে ভক্ত আচার্য্যগণ পরম্পরাক্রমে ভাগবত প্রসাদ বিতরণ করিয়া সেই লীলা ও পুণ্যধারা আজিও অব্যাহত রাখিয়াছেন--আচার্য্য কেদারনাথ (কৃষ্ণানন্দ বাবাজী মহারাজ) তাঁহাদেরই উত্তরসাধক।

এরূপ ভক্তজনের প্রতি আর্ত্ত ও রসপিপাসু মানুষ ও সমাজের আকর্ষণ স্বাভাবিক। তাঁহার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য সর্বদাই আমাদের আকর্ষণ করিয়াছে তাহা—তাঁহার উদারতা, আন্তরিকতা ও ভক্তজনোচিত বিনম্রতা। শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আপন নিরহংকার ও সহজ সরল আচরণের অন্তরালে সযত্নে লুকাইয়া রাখিতেন—প্রকট করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হন নাই। যথার্থ --ভক্ত ও ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছেন—আপন মাহাত্ম্য প্রচারে বিরত থাকিয়াছেন।

ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত, পাঠরত, আচার্য্যের সহাস্য সদানন্দময় উপস্থিতি ও পাঠবাড়ী পরিবেশ অভিন্ন। তাই, আজ, নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট, তাঁহার অনুপস্থিতি অকল্পনীয়।

— শ্রীঅজিত কুমার নায়ক
বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট

'রঘুনাথের চোখে কেদারনাথ'

পতিত পাবন প্রভু নিতাইচাঁদের করুণা বিতরণের ভার যাঁদের উপর পরবর্তীকালে ন্যস্ত ছিল তাঁদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল তারকা আমার প্রিয় "কেদারদা" চলে গেলেন। বৈষ্ণব জগতে এটা বড় দুঃসংবাদ। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের হাতে গড়া, তাঁর করুণার মূর্ত্তি জীবন্ত বিগ্রহ প্রকাশ পেত যখন নয়ন দৃষ্টি বন্ধ ক'রে অনর্গল গৌর গোবিন্দ কথা পরিবেশন করতেন। কত জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান ক'রে তাকে পরতত্ত্ব বস্তুর উপর দাঁড় করিয়ে নিতাই তত্ত্ব আশ্রয় ও গৌর বিষয় করে কথা রসের ভাণ্ডার পরিবেশন করে শ্রোতাদের কর্ণে তৃপ্তিদান করতেন। তাই তিনি 'ভুরিদা জনাঃ'। আমার পিতা প্রভুপাদ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রী ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামীজীর সঙ্গে তিনি পাঠ-বাড়ীতে, পুরী গম্ভীরাতে, আইটোটাবাগানেতে, টোটাগোপীনাথ উৎসবে, পাণিহাটীতে ও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে ও অনুষ্ঠানে দেখেছি দুজনের মধ্যে গভীর আলোচনা হ'ত, গৌর কথা নিয়ে। পিতা প্রভুর আমন্ত্রণে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর ৫০০তম আবির্ভাব উৎসবে লেকটাউনে শ্রীগুরুধাম মন্দিরে এসে আমাদের আরও কাছের জন হ'য়ে যান। এর পর থেকে যখনই কোন জায়গায় ৫/৭ দিন পাঠের অনুষ্ঠান হোত, তিনি উদ্যোক্তাদের বলতেন ধীরেন প্রভু ও তাঁর ছেলেদের নিয়ে যান। তাঁরা চমৎকার গৌর কথা বলেন। একথাগুলো তাঁদের কাছ থেকেই শুনেছি, এবং অবাক হয়েছি এই ভেবে যিনি এতবড় পণ্ডিত, আত্মপ্রচারবিমুখ বৈষ্ণব, সুপাঠক, তিনি কিনা সবাইকে আমাদের নিয়ে পাঠ করাতে বলতেন। পিতা প্রভুর অপ্রকটের পর ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভাগবত পাঠে গিয়ে কোথাও কোথাও "কেদারদার" সঙ্গ হ'ত। যেমন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ৫০০তম উৎসবে ত্রিবেণী হরিসভাতে গিয়েছি—তিনি সভাপতি আমি উদ্বোধক। সেই রাত্রি থাকলাম, তাঁর সঙ্গে একত্রে প্রসাদ পেলাম। কত রসের কথা আরম্ভ করলেন। এরকম অনেক অনেক স্থানে একত্র থেকেছি, দুজনেই পাঠ করেছি নিতাই কৃপায়। রাণীপার্ক হরিসভার তিনি উৎসব সভাপতি ছিলেন এবং তিনি আমাদের দিয়ে সেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কার্য্য অধিবাস কীর্তন, পাঠের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। সে কথা আজও আমি স্মরণ করি। পুরীতে গম্ভীরায়, ঝালির দিন পাঠের পর প্রতিবৎসর তাঁকে আমি গম্ভীরা আয়োজিত নিখিল ভারত বৈষ্ণব সম্মেলনে বক্তৃতার জন্যে আমন্ত্রণ দিতাম এবং তিনি হাসিমুখে মেনে নিয়ে বলতেন—প্রভু বৈকাল ৫টায় এলে হবে তো? এ বৎসর যখন পুরীতে ঐ অনুষ্ঠানে যাব তখন বার বার ঐকথা মনের ভেতর আঘাত করবে। কিছুদিন আগে সল্টলেকে এক ভক্ত বাড়ীতে অনুষ্ঠানে আমাদের দুজনেরই নিমন্ত্রণ ছিল। পাঠবাড়ীর মোহান্ত শ্রীমৎ মধুসূদন দাসজী ও বৈষ্ণবগণও সেখানে ছিলেন। কেদারদা পাঠ করছেন। যদিও শুনেছি তার কথা বলা বারণ, পাঠ করা নিষেধ, ডাক্তারের নির্দেশ। আমি ঐখানে যেতেই হেসে বললেন প্রভুজী আসুন, বসুন। পাঠ শেষ হ'লে একটু ফল প্রসাদ পেলাম। তিনজনে অর্থাৎ মোহান্তজী

মদনদা, কেদারদা ও আমি। হঠাৎ ফটো তোলা শুরু হ'ল। কেদারদা আমাকে ধরে নিয়ে দুজনের মাঝে বসিয়ে ফটো তুললেন। রসের কথা উঠলো—বললাম আপনারা দুজনেই তো বাবাজী আর মাঝে গৃহস্থ কেন? তিনি উত্তর দিলেন প্রভু আপনাদের থেকেই তো আমরা। আমরা যে নিত্যানন্দের গণ, রাধারমণের গণ। কত সুন্দর কথা। শেষ দেখা হ'ল গত আমবারুণীতে। মহাপ্রভুর আগামী দিনে ৬৪ মোহান্ত ভোগমণ্ডপে মদনদা টেনে নিয়ে মঞ্চের পাশে নিয়ে কেদারদার পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ভি ডি ও ক্যামেরাতে সেটা তোলা হ'ল। সাক্ষী রইল ৬৪ মোহান্তগণ এবং অগণিত গৌর ভক্তমণ্ডলী। হাসিমুখে আমাকে পাশে নিয়ে কেদারদা বললেন—প্রভু ভাল আছেন তো? এই কথা শুনে আমি বললাম সব নিতাই-এর ইচ্ছা। তিনি আরতী দেখে ঘরে গেলেন। এর পর বৈশাখ মাসে সত্যিই তিনি চলে গেলেন, শ্রীপাদ বাবাজীর ঘরে, নিতাইচাঁদের ঘরে। আজ তাঁর বিরহ উৎসবে আমার আমন্ত্রণ এসেছে ভাগবত পাঠ করার জন্য। স্মরণ সভায় মঙ্গলাচরণ করার জন্য। মনে পড়ে সেদিন ধাড়সা মঠে তাঁর সঙ্গে বসে গ্রন্থাগার উদ্বোধনের ভাষণ দিয়েছি। শ্রীশ্রী বৈষ্ণব চরণ দাসজীর স্মরণ সভায় তিনি নিজে তাঁর পাশে বসিয়ে আদর করে কোলে টেনে নিয়ে গৌর কথা বলতেন। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের তিথি উৎসবে বৈষ্ণব খণ্ডে আমার পাঠ আরম্ভ হলেই ঘরের বাইরে এসে বসে পাঠ শুনতেন। আজ তাঁর স্মরণ সভায় আবার যেতে হচ্ছে জেনে বড় দুঃখ লাগছে। আপনাদের সকলের প্রতি তাঁর অকৃপণ করুণা বিতরিত হোক, কুল দেবতা নিতাই চরণে এই প্রার্থনা করছি।

—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী এম. এ.

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে ও দৃষ্টান্তে বাঙ্গালীজীবনে যে প্রেমময় রসমূর্তি ফুটিয়াছিল, নবদ্বীপ সে রূপের তরঙ্গে ভাসিয়া গেল।"

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

একে একে নিভিছে দেউটি

হৃদয়ের নিভৃততম সিংহাসনে বিরাজিত অভিন্ন-চৈতন্য-তনু শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কৃপাদেশে শ্রদ্ধা জানাই আমাদের প্রিয়তম শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজকে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ভাষায় প্রকাশ করিলে :—

"কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ, কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন॥
কাঁহা মোর ভট্ট যুগ কাঁহা কবিরাজ।
এক কালে কোথা গেলা, গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?"

শ্রীমতী ললিতা সখীমা অনেকদিন ছাড়িয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজ আমাদিগকে অনাথ করিয়া গেলেন। শ্রীপাদ গোবর্ধন জ্যাঠা বাবাজী মহারাজ, শ্রীমৎ অদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজ, নন্দ জ্যাঠা বাবাজী মহারাজ—সকলেরই অদর্শন হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেবার ভোগ শ্রী গৌরলীলার উপভোগ শ্রীপাদ গোবর্ধন দাস জ্যাঠা বাবাজীর সেবা নিষ্ঠা, শ্রীল নন্দ দাস জ্যাঠা বাবাজীর শ্রীপাদ রামদাস বাবাজীর আনুগত্যে শ্রীমৎ রাধারমণৈকচরণনিষ্ঠা একে একে সকল প্রবেশ-দ্বারই রুদ্ধ হইয়া গেল। শেষ রহিলেন আমাদের বেষাশ্রিত শ্রীল কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ।

১৩৯৭ সালের ১৫ই বৈশাখ রবিবার বেলা ৩-৪০ মিঃ সময়ে নিত্যসিদ্ধ শ্রীপাদ ভাগবতাচার্যের শ্রী পাঠবাড়ী আশ্রম হইতে আমাদের প্রাণকোটিপ্রিয় শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ আমাদিগকে কলিকাল কবলে নিক্ষেপ করিয়া শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণকমলাশ্রয় করতঃ শ্রীশ্রী রাধারমণ দাস বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে বিলীন হন।

শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দজী ১৩৮৯ সালের কার্ত্তিক মাসে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোবিন্দকুণ্ডে ভজনশীল শ্রীল রামানন্দ দাস বাবাজীর নিকট বেষাশ্রিত হন। শ্রীল রামানন্দ দাস বাবাজীও শ্রীশ্রী রাধারমণ চরণ দাস দেবের অনুগত বৈষ্ণব ছিলেন।

জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ভক্তিগ্রন্থাদি পঠন-পাঠনে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পাঠ কালে শ্রীগুরু রামদাস বাবাজী মহারাজের উদ্গীত কীর্তন গানের রসধারা ঝংকৃত হইত। অনুভবী শ্রোতা বা ছাত্রদিগের মধ্যে আমার পুত্র শ্রীমান স্বরূপ দামোদর অন্যতম ছিলেন এবং কৃষ্ণানন্দ মহারাজ

তাহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন। একদিন শ্রীমান স্বরূপের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে আমার পাঠের বক্তৃতাবলী সবই আমি দিয়া গেলাম। সুতরাং তোমরা এই পাঠের ধারা যথাযথ অনুসরণ করিয়া আমার আনুগত্য বজায় রাখিও।

শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দের বেষাশ্রয়ের পূর্ব্বনাম শ্রীকেদার নাথ রায়। জন্ম ১৩২০ সাল, রবিবার। পিতা রামবংশ রায়। মাতা শ্রীমতী বিপৎতারিণী দেবী। জন্মস্থান কোতলপুর, জেলা বাঁকুড়া।

শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ১১ বৎসর বয়সে দর্মাহাটা মঠে শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে বরাহনগর পাঠবাড়ী আশ্রমের সন্নিকটস্থ পণ্ডিত গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতশাস্ত্রীর নিকট কাব্য ব্যাকরণ পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও উপাধি লাভ করেন।

জয় হউক ; শ্রীশ্রীরাধারমণবাগে বিরাজিত শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের জয় হউক, অনঙ্গানন্দদা কুঞ্জের সখীমা ও শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের জয় হউক, শেষ জয় আমাদের পরমপ্রিয় শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজকে। এই নিলাজ পরাণ মৃত পশু পাখির মত যতক্ষণ দেহে থাকে ততক্ষণ আমাদের সোদরোপম শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর স্মৃতি লইয়া বিহার করে।

—শ্রীনিমাইচাঁদ গোস্বামী

"ভগবান করুন, আমরা যেন সকলেই গৌরাঙ্গের মদনমোহনে দগ্ধ হই।"

—মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত

"আর হবার নয়"

শ্রী পাঠবাড়ীর "কেদার দাদা" আর আমাদের কাছে নাই—এই অবিশ্বাস্য, মর্মান্তিক দুঃসংবাদ যখন জনৈক ভক্তের কাছে শুনলাম—তখন প্রথমে কিছুতেই এই সংবাদ সত্য ব'লে মেনে নিতে পারিনি। অমন সদা হাসিমাখা, প্রসন্নবদন আনন্দের মানুষটির মর্ত্যলোক থেকে হঠাৎ বিদায় গ্রহণ—এই সংবাদ শুনে বড় ব্যথা অনুভব করছি।

বৈষ্ণব জগতে আজ বড়ই দুর্দিন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ তম আবির্ভাব বর্ষের প্রাক কাল থেকে একে একে আচার্য্যগণ চ'লে যাচ্ছেন—যার নবতম সংযোজন "কেদার দাদার" মহাপ্রস্থান। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যায় শ্রীধাম বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর মহত্তম ধারার সুযোগ্য ভগীরথ আমাদের "কেদার দাদা"। এই অভাব পূর্ণ হবার নয়।

কারো আচরণ আছে—প্রচার নেই, আবার কারো প্রচার আছে--আচরণ নেই। যাঁর মধ্যে দুটিই আছে—তিনিই যথার্থ আচার্য্য। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আচার্য্যরূপে পেয়েছিলাম তাঁকে। অল্প দিনের জন্যে হলেও রেখে গেলেন 'দ্বাদশ ভাষণ', 'গোপীগীত', 'নাম মহিমা', ইত্যাদি কয়েকটি সুললিত গ্রন্থ। আবার তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা ভক্তজনের অন্তরে প্রবেশ করে অপূর্ব প্রেমানন্দরসে মনকে মাতিয়ে দিয়েছে।

আমার পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সাথে তাঁর যে প্রেম, প্রীতি ব্যবহার দেখেছি তার তুলনা নেই। আমার মত ক্ষুদ্র জীবও তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছে। বার বার দেখেছি তাঁর বিনয়নম্র ব্যবহার ও মর্য্যাদা দান। মুগ্ধ হয়েছি প্রীতি ও ভালোবাসায়।

বৈষ্ণব জগতে আরো কিছুদিন থাকতে পারলে এবং আমাদের মাঝে আরো কিছুদিন থাকলে আমরা অনেকখানি উপকৃত হতাম। প্রভু নিতাই চাঁদ তাঁকে কাছে নিয়ে গেলেন, কিন্তু আমরা বঞ্চিত হলাম। "কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।" সবার উপরে প্রভুর ইচ্ছাই বলবান।

জন্মে জন্মে যেন এই রকম মহৎ সঙ্গ লাভ করতে পারি। এই প্রার্থনা প্রভু নিতাই চাঁদ চরণে রাখি। জয় নিতাই, জয় গৌর ॥

—প্রভুপাদ শ্রীদিলীপ কুমার গোস্বামী

श्री कृष्णानन्द दास बाबाजी महाराज के वृन्दावनवासी भक्तों की ओर से

श्रद्धाञ्जलि

हा देव ! श्रीमन्महाप्रभु के वृन्दावन सुभागमन के उपलक्ष्य में प्रति कार्तिक मास की शुक्ला पूर्णिमा पर जिनके वृन्दावन आगमन के लिये हम वृन्दावन बासी पलक पावड़े बिछाये रहते, जिनके प्रफुल्ल मुखारबिन्द के दर्शन के लिये हमारे नेत्रभृंग सदा तरसते रहते, जिनकी मन-प्राण शीतल करनेवाली कथा रसायन का पान करने के लिये हमारे कर्ण सदा उत्कर्ण रहते, जिनके चरणों में लेटकर हम आत्म विस्मृत हो जाया करते. वे क्या आज केवल हमारी स्मृति का ही विषय बनकर रह गये है ? क्या सचमुच उनके सहास्य वदन के दर्शन से हम सदा के लिये वंचित हो गये है ? क्या सत्तमुच उनकी हृद वर्ग रसायन वाणी अब कभी न सुन पायेंगे। क्या सचमुच श्री कृष्णानन्द दास बाबाजी महाराज सदा के लिये हमें छोड़ गये है ?

विश्वास नहीं होता है कि सचमुच ऐसा हुआ है क्यों कि उनका स्मरण करते हैं हमें लगता है कि जसा उनका सुन्दर. सलौना देदीप्यमान मुखकमल अब भी पहले की ही तरह हमारे नेत्रों के सामने अपनी रूपछटा बिखेरता हुआ विद्यमान है जब भी वे मृदु-मधुर स्मृति के साथ स्नेहभरी दृष्टि से हमें देखते हुए हमारा कुशल क्षेम पुछ रहे हैं, हमसे प्यारभरी बातें कर रहे हैं. हमारा शंका समाधान कर रहे हैं और परम पूज्य श्रीरामदास बाबाजी महाराज के पावन संस्मरणों का भाव गदगद कण्ठ से वर्णन करते हुये स्वयं आत्मविभोर हो रहे हैं और हमें आत्मविभोर कर रहे हैं. या हास्यरसपूर्ण किसी लीला कथा का वर्णन कर स्वयं हँस रहे हैं और हमें हँसा रहे हैं।

पर दारुण देव के प्रकोप के कारण विश्वास न करना चाहते हुये भी विश्वास करना पड़ रहा है कि कृष्णानन्द दास बाबाजी महाराज हमारे बीच अब नहीं रहे। उनके साथ ही उनकी कथा परिपाटी भी जो नितान्त उनकी अपनी थी जब बीत गयी। उनकी जटिल से जटिल विषयों को उपमा और रूपकों को माध्यम से सरस और रोचक बनाकर कहने की जो परिपाटी थी. उसका जैसा तैसा अनुकरण भी क्या अब कोई कर सकेगा ? उनकी कथा जैसी सरल होने के साथ साथ गम्भीर और गम्भीर होने के साथ साथ सरस थी. वैसी कथा क्या अब कभी हम सुन सकेंगे।

पर यद्यपि उनके अपने मुख से सुनकर नहीं तो उनकी कथाओं के टेप रिकार्डों को सुनकर और उन पुस्तकों को पढ़कर जिनमें उन टेप रिकार्डों के कुछ अंश प्रकाशित हो चुके हैं हम किसी हद तक उनके अभाव की पूर्ति अवश्य कर सकेंगे और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे।

हम वृन्दावनवासी उनके भक्त उन्हे भावभीनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं और उनके प्रार्थना करते हैं कि निकुञ्जवासी होने के पश्चात् अपनी अप्रकट अवस्था में भी वे अपनी कृपा दृष्टि हम पर पूर्ववत् बनाये रखे और अपनी मङ्गल कामना से हमारा भी निकुञ्ज प्राप्ति का पथ प्रशस्त करते रहें।

—डा० अवध बिहारी लाल कपूर एम० ए०, डी० फिल

৺ঠাকুর রসে বশে ছিলেন

আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবার তো কোনও উপায়ই ছিল না। সেই গানে আছে, 'আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ।' সিদ্ধ মহামানবরা জানেন কাকে কোন্ সময় কোথা থেকে ডেকে আনতে হয়! এই ডাকই হল কৃপা। দীক্ষা হল কৃপা ঠিকই! ডাক হল কৃপার মুখবন্ধ। কারণ একটা ছিল অবশ্যই। সে কারণের জন্যে অনেক বড় বড় মানুষ ছিলেন। তবু আমাকে কেন? কারণ একটাই। তাঁর পূত জীবনের ছোঁয়ায় আমার জীবনের একটা দিক খুলে দেবেন বলে। পাণ্ডিত্য ও ভক্তি মিশ্রিত আধ্যাত্মিকতার স্বরূপটি চেনাবেন বলে। ধর্মেও যে রস আছে সেইটি ধরিয়ে দেবেন বলে।

আমি এক মূর্খ। কতটা মূর্খ, তমোগুণী, অহঙ্কারী তার পরিমাপের জন্যে আমার জীবন নিয়ন্তা তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিলেন। সে এক সকাল। ভক্তজন পরিবৃত হয়ে বসে আছেন তাঁর ঘরে। প্রসন্ন মূর্তি। নিজের অন্তরে নিজেকে খুঁজে না পেলে এই প্রসন্নতা আসে না। উজ্জ্বল। সমর্পিত না হলে এই জ্যোতির বিকাশ হয় না। সব সময় মুখে যে মৃদু হাসিটি লেগে থাকত সেইটাই ছিল তাঁর বোধি।

অল্প কয়েকদিনেই বুঝে গেলুম, এই মহামানব এমন এক স্তরে নিজেকে নিয়ে যেতে পেরেছেন, যে স্তরে উঠলে জগৎ ও জীবন হাতের মুঠোয় এসে যায়। যে বোধে উপনীত হলে মানুষের সত্য দর্শন হয়। শাস্ত্রজ্ঞান কা কথা, সধতত্ত্ব উদিত হতে থাকে মনে। শাস্ত্রজ্ঞান নয় তখন শাস্ত্রদর্শন হয়।

ভাগবতে এত বড় পণ্ডিত আমি দেখিনি। এমন একটা অবস্থা—ভাগবতই তিনি, তিনিই ভাগবত। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে তিনি ইচ্ছা বিচরণ করতেন। গ্রন্থাদি দেখারও প্রয়োজন হত না, অধিকাংশই ছিল কণ্ঠস্থ। পাণ্ডিত্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ সহজ প্রকাশ। কঠিন তত্ত্বকে সর্বজন-বোধ্য করে আকর্ষণীয় করে পরিবেশন। তাঁর ভাষণ ছিল অমৃতোপম। ছেড়ে ওঠার উপায় ছিল না। অনেকটা যে শুনেছে, সেই মজেছের মতো।

তাঁর সমাবেশে তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়ও দিতেন। দিয়ে দেখতেন আমার দৌড় কতদূর। আমাকে এলোমেলো ছুটতে দিয়ে হঠাৎ চেপে ধরতেন। ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করতেন। ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র থেকে বিশাল থেকে বিশালতর হতে হতে পর্বতের মতো হয়ে উঠতেন। কোথা থেকে কোথায় চলে যেতেন! একবার এই শ্লোক ধরে টানেন তো আর বার ওই শ্লোক। শাস্ত্রমন্থন। তত্ত্বের সঙ্গে হাস্যরস মিলিয়ে যে উপাদান তিনি রচনা করতেন তার নাম জ্ঞানসন্দেশ।

মৃদুভাষী, নীরব, অথচ ব্যক্তিত্বময়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন রসে বশে থাকতে। আমার দেখা এই মহামানব ছিলেন তারই উদাহরণ।

—শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দেরী হয়ে গেল

আজ থেকে ২২/২৪ বৎসর আগের কথা। এক গ্রীষ্মের দুপুরে বাসন্তী এলো আড়্যাপীঠে আমার সঙ্গে দেখা করতে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী। অভিন্নহৃদয় বন্ধু। খুব নাম ডাক বাসন্তীর। কলেজের অধ্যাপিকা বলেই শুধু নয়, ভাল ভাগবত পাঠিকা বলেও। ভাবি, ওতো বেদান্ত পড়েছে—তবে ভাগবত পাঠিকা হলো কেন? কি রস পেয়েছে ভাগবতে? চাইলাম ওর কাছে ভাগবত পড়তে। সে বলে আমি কি পড়াবো তোকে? তার চেয়ে চল্ তোকে নিয়ে যাই ভাগবত সমুদ্রের কাছে—আমি যাঁর কাছে পড়ি।

আমায় নিয়ে বাসন্তী বরাহনগর পাঠবাড়ীতে এলো। এর আগে আসিনি এখানে। বাসন্তী আগে, আমি পিছনে। তার অধ্যাপকের ঘরে ঢুকেই বলে উঠলো—কেদারদা, আমার বন্ধুকে এনেছি আপনার কাছে ভাগবত পড়াতে। বেলা কিন্তু কট্টর বেদান্তী। দেখলাম বসে আছেন নীচু চৌকিতে বিছানায়। সামনে সতরঞ্চি পাতা। বৈষ্ণবোচিত চেহারা। প্রণাম করে বসলাম। মুখের দিকে চেয়ে বললেন—একে দেখেছি বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদে পরীক্ষকদের সভায়। তিনি দেখেছেন, আমি কিন্তু দেখিনি। আজ সেই গল্প মনে পড়ছে। অন্ধ চলেছে বদ্রীনারায়ণের পথে। জিজ্ঞাসা করা হলো—কেন যাচ্ছেন? আপনি তো দেখতে পাবেন না। অন্ধ বৃদ্ধ উত্তর করে—আমি না দেখলেও তিনি তো আমায় দেখবেন। তাই বলি আমি দেখিনি, তিনি কিন্তু দেখেছেন।

পড়া শুরু হ'লো। বেদান্ত নব্যন্যায় পড়েছি বলে মনের কোণে অহং জমেছিল। পড়ছেন সনাতন গোস্বামীর টীকা ভাগবতের। শঙ্করের অদ্বৈত মত কেটে কুচি কুচি করছেন। তার সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃত থেকে পুরীতে সার্বভৌমের মহাপ্রভুকে বেদান্ত পড়ানোর জায়গাটি পড়লেন। শঙ্কর-ভাষ্য সহ বেদান্ত সূত্র পড়াচ্ছেন। মহাপ্রভু হ্যাঁ না কিছুই বলেন না। সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করেন মহাপ্রভু বুঝছেন কিনা? মহাপ্রভু উত্তরে বলেন—সূত্র বুঝি, ভাষ্য বুঝি না। সার্বভৌম অবাক—বলে কি? সূত্র বোঝাতেই ভাষ্য। এ সূত্র বোঝে, ভাষ্য বোঝে না!

আমার এতদিনের গড়ে তোলা বেদান্তের ভিৎ নড়ে উঠলো। ভাবলাম আমাকে হারাবার জন্য এইসব বলছেন। অভিমানে মন ভরে উঠলো। মাথা নীচু করে থাকতে থাকতে অপমানে, দুঃখে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। চেষ্টা করেও থামাতে পারলাম না। ভল্ ভল্ করে জল পড়তে লাগলো। পণ্ডিতমশাই-এর পড়া থেমে গেল। বাসন্তী চিমটি কেটে আমায় সাবধান হতে বললো। আমি তখন নিজের হাতের বাইরে। রাগ করে বাসন্তী উঠে দাঁড়ালো আমায় নিয়ে। পণ্ডিতমশাই ভেবাচেকা খেয়ে গেলেন।

পাঠবাড়ীর বাইরে এলাম। বাসন্তীর যা মুখে এলো তাই বলে আমায় গালাগালি দিল। আমায় আর কখনও এখানে আনবে না। আমিও জানি এখানে আসবো না। আর শঙ্করকে গালাগালি আমি সহ্য করবো না।

আদ্যাপীঠে ফিরে এলাম। মন খারাপ। দু এক দিন বাদে ভাবলাম—গিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে আমার সেদিনের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিই। আর ভাগবত আমি পড়বো না—একথাও বলে আসি।

এখনও ছবির মত সেই দিনের কথা মনে পড়ছে। একা গেছি পাঠবাড়ী, ভয়ে ভয়ে। পণ্ডিত মশায়ের ঘরে ঢুকলাম। তিনি বাল্য-ভোগে বসেছেন। কতটুকু খেয়েছেন জানি না. আমায় দেখে অবাক। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে উঠে সামনে বসে বললেন—আমার কি দোষ? টীকায় যা আছে পড়তে হবে তো। আমি আরো লজ্জায় মরে যাচ্ছি। আমার অবস্থা দেখে দয়া হলো—বললেন—জান, মহাপ্রভু কি বলেছেন শঙ্কর মতকে? চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—"আচার্য্যের দোষ নাই, ঈশ্বর আজ্ঞা হইল"। অন্য সম্প্রদায়ের গুরুকে আচার্য্য বলে সম্বোধন করলেন"। ঈশ্বরের আদেশেই এই মতবাদের প্রকাশ—এটাও বলেছেন মহাপ্রভু।

সব অভিমান মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। মহাপ্রভুর উদার মনোভাব দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত হলো। তারপর বিশ বছর ধরে কত ভাগবত পাঠ শুনলাম। ভাগবত পড়তে লাগলাম। ধীরে ধীরে বয়সের ভারে, শরীরের অপটুতায় পাঠবাড়ী বেশী যেতে পারতাম না। বেশী দিন দেরী হলে একে তাকে বলতেন—বেলা আসে না কেন?

কিছু দিন আগে চোখের ছানি কাটিয়ে হাসপাতাল থেকে আশ্রমে এসেছি। ছানি কাটানোর ৫ সপ্তাহ হয়েছে। এবার একদিন বার হবো, সঞ্জীবের বাড়ী নিমন্ত্রণ। মনে মনে ঠিক করেছি আগে পাঠবাড়ী গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে, তারপর সঞ্জীবের বাড়ী যাবো। আশ্রমের একটি মেয়ে ভুল খবর দিল—বিকালে সঞ্জীব যেতে বলেছে। রবিবার ৫টা ১৫ মিঃ। পাঠবাড়ীর গলিতে রিক্সা করে ঢুকছি। ঐখানে দাঁড়ানো রিক্সাওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁরে আমার বাবা আছে তো মঠে? একজন আমার কাছে এসে বললো—না, তিনি তো নেই। জিজ্ঞাসা করি—কোথায় গেছেন? উত্তর এলো—এই এক ঘণ্টা আগে দেহ রেখেছেন। কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না—ঢুকলাম পাঠবাড়ী। স্তব্ধ আশ্রম। ঘরে ভক্ত মায়েদের চাপা কান্না। বিছানায় নিদ্রিত মূর্তি। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। মনে মনে বললাম—বাবা ক্ষমা করুন। আমি দেরী করেছি বলে মুখ আর দেখলেন না।

সঞ্জীবের বাড়ী গেলাম। তারাও দুপুরে কেন খেতে আসছি না বলে আমার জন্য অপেক্ষা করেছে। আশ্রমের মেয়েটির উপর ভুল খবর দেওয়ায় মনে মনে দুঃখিত হলাম। সঞ্জীব সান্ত্বনা দেয়—"দুর্গার উপর রাগ ক'রো না মা। এটা ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়েছে। তোমার আর্তিটা বেশী বাড়বে বলে।" শুনলাম, কিন্তু মন মানে না, সে হায় হায় করছে।

—ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী

Dedicated to :

'Our Revered Gurudeb'

'As the Sun descends, below the horizon, casting it's final rays on the Earth, and the black veil covers it, I know that tomorrow, it will be back to guide us, and deliver us from doubt........'

Going all the years back, I recollect vivid memories of not only a religious figurehead, but of a guide, a friend, a philosopher and a man, who devoted all his time doing good for all. He Influenced all of us, particularly me, in His subtle, charming way. Compulsively. His smile always lit my soul.

At the tender age of two, my eldest sister received her 'sacred hearing' or 'diksha' and simultaneously, she lost her senses. Such was the power, He had.

In the following years, she suffered from an attack of jaundice, when the practitioner gave a final statement of hopelessness for her. It was also then that He sat hour after hour, by her head, chanting, and by His Grace, she was cured, completely. Such was also our Gurudeb.

I was sent to a residential school at the age of 12. But as a compulsion. He was ever with me, in my album, my wallet, and most strongly, in my heart. During my vacations, I always visited Him on auspicious occassions, and otherwise. He was, is, and forever will remain with me, for He is, but a part of me ; my heart.

Today, He leaves us, to visit his Heavenly Abode, watching over all, and always guiding us. We are most fortunate to have acquired a place at his feet, and I know for sure, that He, the omnipretent will forever look upon us, and deliver us from evil.

'O Lord ! Knowing fully well, that He is you, and you are Him, we pray heartfully, that, may his soul rest in peace in your eternal abode.'

—Radhika Mohan Singh Roy

শ্রদ্ধাস্পদ কেদারনাথ রায়ের স্মৃতিচারণ

শ্রীচৈতন্য ভাবাশ্রিত ভক্তিধারা ভারতের মানসভূমিকে এককালে উন্নততর মানবসভ্যতায় রূপান্তরের উপযোগী উর্ব্বরাশক্তি দান করেছে। সে ভক্তিরস ফল্গুবাহিত হয়ে আজও বাংলার তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্যোগ আয়োজনে বিধৃত। যা এককালে ছিল ভক্তি-প্লাবন আজ তা ক্ষীণ ধারায় জলসিঞ্চন হলেও বৈষ্ণবোচিত সমস্ত লক্ষণ তাতে প্রতীয়মান। বরাহনগর পাঠবাড়ী এমনি একটি ঐতিহ্য সযত্নে বহন করে এসেছে, আর সাম্প্রতিককালে তার প্রাণপুরুষ ছিলেন কেদার-দা অর্থাৎ কেদারনাথ রায়, সাতাত্তর বৎসর বয়েসের নশ্বর দেহভার যিনি পৃথিবীর বুকে ভস্মাকারে রেখে গেলেন বিগত ২৯ এপ্রিল অপরাহ্ণে। সজ্ঞানে দেহরক্ষা, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও প্রয়োজনীয় আশ্রমিক নির্দেশাদি দিয়ে গেছেন বন্ধু-পরিকরবর্গকে।

বাঁকুড়া জেলায় কোতুলপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ভক্ত-পরিবারে জন্ম। প্রখর মেধাবী কেদার কৈশোরেই বাবাজী মহারাজ রামদাসজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন ও দীক্ষিত হন। আপন মেধাগুণে এগারো বৎসর বয়সেই ব্যাকরণতীর্থ ও চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করেই হন পুরাণ ও কাব্যতীর্থ। উনিশ বৎসরে যৌবনের প্রারম্ভে দার পরিগ্রহণ কিন্তু অনতিকাল পরেই স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা সংসারের সমস্ত বন্ধন থেকে কেদারনাথকে মুক্ত করে ইহধাম ত্যাগ করেন। তারপর থেকে একটানা সন্ন্যাসধর্ম; অবশ্য পাঠবাড়ীর বৃহৎ বৈষ্ণব সমাজের মাঝখানে থেকে। প্রথমে কিছুদিন নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে বৈষ্ণবগুরু চরণদাস বাবাজীর আশ্রমে ভাগবত পাঠে নিয়মিতভাবে আত্মনিয়োগ করেন। স্বয়ং বাবাজী মহারাজ রামদাসজী নিজে উপস্থিত থেকে কেদারনাথের অপূর্ব ভক্তি-রসাপ্লুত পাঠ আস্বাদন করতেন। কিছুকাল পরে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠান বরাহনগর পাঠবাড়ীতে। এই পাঠবাড়ী পরবর্তী-কালে হয়ে ওঠে কেদারনাথের তপশ্চর্য্যার পদ্মাসন ও স্বর্গারোহণের সোপান। কয়েকযুগ ধরে পাঠ-বাড়ীর অন্যতম ট্রাষ্টী ও কর্ণধার হিসেবে কেদারনাথ ছিলেন অগণিত শিষ্যবর্গ ও ভক্তবৃন্দের পরম আশ্রয়স্থল, বিপদে বন্ধু, সম্পদে নির্দেশক, শোকে সহায় ও আনন্দে অংশীদার। শুধু ভক্ত শিষ্য সম্প্রদায়ে সীমিত ছিল না তাঁর দাক্ষিণ্য। তিনি ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন নিজেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে, উদ্বুদ্ধ করেছেন হাজার হাজার শ্রোতাকে, তাঁর বৈষ্ণব-ব্যাখ্যা যিনি একবার শুনেছেন, তিনি পেয়েছেন গভীর জ্ঞানের সন্ধান আর অপার্থিব আনন্দের শিহরণ।

আমার সাথে কেদার-দার পরিচয় মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-পঞ্চশত-জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির কর্ম্মসূচীকে কেন্দ্র করে। আমরা যারা মূলতঃ গৃহী, আমাদের ঘনিষ্ঠ সংশ্লেষের প্রয়োজন ছিল তাঁদের, যাঁরা জীবনাচরণে বৈষ্ণব অর্থাৎ 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন, কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। মূর্ত প্রতীক পেয়ে গেলাম পরম শ্রদ্ধাস্পদ

কেদার-দার মধ্যে। তারপর থেকে তিনিই ছিলেন আমাদের বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও পরামর্শদাতা। তাঁর সান্নিধ্যে পেয়েছি এক নিবেদিত আত্মার ছোঁয়াচ, যিনি সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে এবং যাবতীয় সংকীর্ণতার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বিরল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কেদারদার বাগ্মিতা, ভাগবত ব্যাখ্যা ও সুললিত পাঠ ছিল আমাদের পরম পুঁজি তা কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসূচী রূপায়ণে বারে বারে অকৃপণভাবে নিজেকে উজাড় করেছে আর সার্থকতার সোপান রচনা করেছে। আজ অশ্রু-সজল বিয়োগ-ব্যথায় তাঁর মধুর স্মৃতি, সুপুরুষ অবয়ব, সুকণ্ঠের বাগ্মিতা ও উদার সহাস্য আনন আমাকে উদ্বেল করে। তাঁকে আমার অজস্র প্রণাম।

—শ্রীধ্রুবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৫ই বৈশাখ, পণ্ডিতপ্রবর পরম শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণানন্দ বাবাজী মহারাজ স্বাভীষ্ট ধামে গমন করলেন—যিনি ছিলেন বৈষ্ণব ভাবনার অন্যতম পথ প্রদর্শক—সেবা নিষ্ঠা বিনয়ের এক উজ্জ্বল ভাবাদর্শ। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী মহারাজের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ ভাবমধুর প্রেম-সম্পর্ক। বৈষ্ণব চিন্তনের প্রথম পর্য্যায় 'দৈন্যতা' তদুপরি 'আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ' এ সমস্ত বৈষ্ণব ভাবের মিলন ঘটেছিল কৃষ্ণানন্দ বাবাজী মহারাজের পুণ্য জীবন সাধনায়—ব্যবহারিক ভক্ত-মিলন-চর্য্যায়। আজ তাঁর মহাপ্রয়াণে বৈষ্ণব ভক্ত সমাজে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল। তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধাপ্রণতি নিবেদন করি।

—গুরুরাজ কিশোর গোস্বামী

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি

শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ সমীপেষু

শ্রীচরণকমলেষু,

ভক্তিপূর্ণ প্রণামান্তে নিবেদন,

আপনার নির্দেশমত কিছু লেখার চেষ্টা করেছিলাম। আমার বাবার কাছ থেকে জ্যাঠা মহাশয় সম্পর্কে যে সব কথা শুনেছিলাম এবং নিজে তাঁকে দর্শনের সুযোগ পেয়ে যা দেখেছি তার ভিত্তিতেই কিছু লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করেও দেখলাম একজন সত্যদ্রষ্টা, পরম ভাগবত, অসাধারণ সাধক সম্বন্ধে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে হলে ভাব ও ভাষার সম্পর্কে যে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার তা আমার মত মানুষের নাই। তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে তাঁর মহত্বকে উপলব্ধি করতে হয়। সেই উপলব্ধি অস্পষ্ট ও ভাষা অত্যন্ত দূর্বল, তাই মনে হল তাঁর কথা পাঁচজনের কাছে উপস্থাপনা করা মানে নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা, আমার কোন যোগ্যতা নাই।

আপনি আপনাদের স্নেহাশ্রিত এই কন্যাকে ক্ষমা করবেন। আমি উৎসবের সময়ে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে পারব আশা করি।

সভক্তি প্রণামান্তে নিবেদন ইতি—

বিনীতা—

লীনা চক্রবর্ত্তী

(স্বাস্থ্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

"এই বঙ্গদেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসূতি"

—শ্রীভুদেব মুখোপাধ্যায়

পরম ভাগবত
শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর মহাপ্রয়াণে—

বৈষ্ণব জগতে পরম ঐতিহ্যমণ্ডিত বরানগর পাঠবাড়ীর প্রবাদপ্রতিম অধ্যক্ষ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের চরণাশ্রিত, পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর তিরোধানে আমরা আপনার জনকে হারিয়েছি। এমন নিরহঙ্কার পণ্ডিত ও ভগবৎ ভক্ত আমাদের সমাজে অল্পই আছেন। তাঁকে দেখলেই আমার মনে হত মহাপ্রভুর সেই অমর বাণী :

তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তাঁর জীবনকে অবলম্বন করে বাস্তব হয়ে উঠেছে। আদর্শ বৈষ্ণব আচার্য রূপে তিনি আমাদের হৃদয়ে সতত বিরাজ করবেন।—এই প্রার্থনা।

—স্বামী অমলানন্দ
সেক্রেটারী
রামকৃষ্ণ মিশন
ক্যালকাটা ষ্টুডেন্টস হোম,

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বৈষ্ণব-চুড়ামণি-শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দদাস বাবাজী (পণ্ডিত কেদারনাথ রায় কাব্যব্যাকরণ পুরাণ-তীর্থ) মহাশয়ের আকস্মিক মহাপ্রয়াণের সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় আমাদের নিকট পৌঁছিল। ভক্তিমান সুবক্তা ভাগবতের পণ্ডিত হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁহার মহাপ্রয়াণে ভক্ত-সমাজে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহা পুরণ হইবে না। তাঁহার অমর আত্মা সাধনোচিত ধামে ইষ্টপদে স্থান পাইয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি উর্ধলোক হইতে ভক্ত সমাজের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বর ভাই
সভাপতি, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠ

স্মৃতিপূজা

অতি আনন্দে ভরা অনুভব যে এত তাড়াতাড়ি স্মরণে পরিণত হবে তা ভাবতে পারা যায় নি। অনুভূত বস্তুর পরে চিন্তার নামই তো স্মরণ। এই তো সেদিন, মাত্র বার তের দিন আগে গত ২রা বৈশাখ ১৩৯৭ সাল বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে আমার শ্রীগুরুপাটে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল—নববর্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে প্রণাম এবং সেই সঙ্গে আমার পরম পূজনীয় গুরুদাদাদের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে তাঁদের কাছ থেকে জীবনের চলার পথের পাথেয় কৃপাশীর্বাদ ভিক্ষা করে আনাই উদ্দেশ্য। শ্রীআশ্রমে যখন পৌঁছালাম তখন সকাল ৮টা। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কেদারদাদা মহারাজের (শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ) ঘরের দরজা তখন বন্ধ দেখে অন্য সব জায়গায় প্রণাম জানিয়ে যখন তাঁর ঘরের সামনে এলাম—তখন দেখি দরজা খোলা। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর সেই নীচু ছোট খাটটিতে বসে আছেন সৌম্য শান্তমূর্ত্তি আমার পরম পূজনীয় দাদা মহারাজ—সহাস্যবদন—প্রফুল্ল হাস্য তার শুধু অধরে বা বদনে নয়, দৃষ্টিতেও যেন হাসি ঝরে পড়ে। মহাজনের বর্ণনায় শ্রীল নিত্যানন্দ স্বরূপে বলা আছে—

"প্রণতজনেরে যেন কোল দিতে বোলে—"

দৃষ্টিতে যেন আদর করে কাছে ডেকে নেওয়ার সুর। কাছে গিয়ে শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম—"শরীর কেমন আছে?"—উত্তরে অবসাদশূন্য হয়েই বললেন—"পা দুটো একটু ফুলেছে, মুখখানিও একটু ফোলা ফোলা ভাব।" বললেন, "জানো, গতকাল ১লা বৈশাখ শ্রীপাঠে বসেছিলাম, এই আশ্রমেই, কিন্তু শ্রীপাঠে বেশ সুখ হল না।" জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন, কষ্ট হচ্ছিল?" বললেন—"বুকটাতে একটু ব্যথা লাগছিল।" এই ব্যথাই যে তাঁর বিদায় নেওয়ার নিমিত্ত হবে তখন বুঝিনি। এর পরে কত কথা—কথার অফুরন্ত ভাণ্ডার—কথা কইতে তাঁর কখনও ক্লান্তি ছিল না—সেদিনও কত শাস্ত্র কথা—শ্রীল বাবাজী মহারাজের উপদেশবাণী নিজের জীবনে যা পেয়েছেন বললেন। একদিনের ঘটনা বললেন—শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ তখন কলকাতা পোস্তা রাজবাড়ীতে—দাদা তাঁর খুব কাছে দাঁড়িয়েছেন—শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিঃশ্বাস তাঁর গায়ে লাগছে এমন সময় মৃদুভাষী বাবাজী মহারাজ বললেন, "দেখ, মানে না—কারণ জায়গা দিতে পারবে না।" দাদা ভাবছেন—কি মানে না—কার জায়গা দিতে পারবে না? এত সংক্ষিপ্ত কথা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, তবে শ্রীপাদ যখন নিজেই কথা তুলেছেন তখন সমাধান নিজেই করবেন। পরেই শ্রীপাদ বললেন—শ্রীগুরুরূপা সখী মঞ্জরীর ভজন করে তাতে কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব স্বীকার করে কিন্তু যে স্বরূপে কৃপা হল সে স্বরূপ কি কিছু নয়? এই গুরুস্বরূপ গৌরপরিকর পুরুষ দেহের নিত্যত্ব স্বীকার করলে গৌরলীলার

নিত্যত্ব স্বীকার করতে হয় —সেটি মানে না। দাদাকে বললেন শ্রীপাদ—"তোমাদের কথা বলবার সুবিধা আছে, বলো।" শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের একান্ত কৃপাধন্য দাদা। তাই তাঁর অন্তরের নিগূঢ় ভজন রহস্যটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন। এর পরেও কিছুক্ষণ কথা বললেন—নিজের হাতে একটি শ্লোক লিখে দিলেন, তার অর্থ এ জগতে সকলেই মোহ অর্থাৎ আসক্তি অনলে পুড়ে মরছে কিন্তু তার মধ্যে যে নামাশ্রয়ে থাকতে পারে সে সেই জ্বালায় দগ্ধ হয় না। এখন মনে হচ্ছে এই শ্লোকটিই যেন জীবনে বাঁচবার উপায় রূপে শেষে দান করে গেলেন। যেমন আজ থেকে প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগে বাংলা ১৩৬০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীল নরহরি সরকার মহাশয়ের সূচক কীর্তনে (যেটি শ্রীপাদের শ্রীমুখ নিঃসৃত শেষ কীর্তন) অক্ষর দিলেন—অভিন্ন নাম নামদাতা। "নামদাতা নাম এক জেনে নাম কর প্রাণপণে।" এই পাথেয় না দিলে তাঁর অনুগতজনের বাঁচবার উপায় হত না। শেষে শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেদিনের কীর্তনে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন—"আমার মুখ দেখবে যে আমার মত হবে সে"—এটিও পরম ভরসার বাণী। দাদাও সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন, "নামাশ্রয়ে থাক, তাহলে কোন চিন্তা নেই।" তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে মনে করেই সেদিন তাঁকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম। বেলা তখন দুটো। সেই শেষ প্রণাম, সেই শেষ দর্শন। এর মাত্র কয়েকটি দিন পরেই গত ১৫ই বৈশাখ ২৯শে এপ্রিল রবিবার বেলা ৩-২০ মিঃ একটু বুকে ব্যথা উঠল এবং কুড়ি মিনিটের মধ্যে সব শেষ। তার আগে সারাদিন সুস্থ নিত্যকৃত্য স্নান আহ্নিক প্রসাদ পাওয়া সব করেছেন—সকলকে দেখালেন বেশ সুস্থ আছেন, যাতে কেউ কোন সন্দেহ করেন নি। সকলেই নিজেদের বাজে শ্রীনামযজ্ঞ উৎসবে ভবানীপুর, মধ্যমগ্রামে গেছেন—সকলকে দূরে হাসিমুখে পাঠিয়ে দিয়ে একা একা নিজের ইষ্টপাদপদ্মে অভিসারে গেলেন—মিলনে তাঁর পরম প্রশান্তি—নিজ কক্ষে নিজ শয্যায় চির-শান্তিতে মহানিদ্রায় অভিভূত। কেউ জানল না—কেউ বুঝল না—কাছের লোকও দূরে সরে গেছে—এককের বিরাটত্বের সঙ্গে মহামিলন।

আজ থেকে প্রায় ৩৪/৩৫ বছর আগে দাদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়—শ্রীল বাবাজী মহারাজ আমার গুরুমহারাজ তখন প্রকট—অনেক সময় সকালের দিকে শ্রীপাঠবাড়ী যাওয়া হত ছুটির দিনে—দেখবার সৌভাগ্য হত—শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে দাদা তেল মাখাতেন—আর সেই অবস্থায় কত ভাগবতী কথা প্রসঙ্গ। শুনে মুগ্ধ হতাম—তবে তাঁর শ্রীপাঠ শুনবার সৌভাগ্য তখনও হয়নি। এর পরে শ্রীগুরুদেব অপ্রকট হলেন বাংলা ১৩৬০ সালে। তার কিছুদিন পরে আমার বড় গুরুভাই নিত্যধামগত শ্রীযুক্ত জীবন দাদা (শ্রীমৎ জীবনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী) একদিন আমাকে বললেন—প্রতি রবিবার কেদার শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে পাঠ করে—শুনতে এসো। তাঁরই উপদেশে রবিবার ছুটির দিন বলে অবসরও হত—শ্রীপাঠ শুনতে যেতাম—প্রথম যেদিন শ্রীপাঠ শুনবার সৌভাগ্য হল, শ্রীপাঠের প্রসঙ্গ ছিল—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের শ্রীএকাদশ স্কন্ধের নবযোগীন্দ্র উপাখ্যানের প্রসঙ্গ শুনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হলাম। এমন পাণ্ডিত্য, কথার গভীরে প্রবেশ, সাবলীল মধুর বাচন ভঙ্গী, এমন

ব্যাখ্যা আর তো কখনও শুনিনি। গান নেই, সুর নেই, বাজনা নেই শুধু কথার যাদুমন্ত্রে অগণিত ভক্ত শ্রোতাকে ঘন্টার পর ঘন্টা মুগ্ধ করে রাখতেন—তাঁর জীবনে অপূর্ব শ্রীগুরুকৃপা লাভেরই এটি ফল।

এর পরে তাঁরই কৃপায় কি যে পাঠের আকর্ষণ হল—দাদার শ্রীপাঠ যেখানেই হোক্ যাওয়া চাই। তখন কলকাতায় থাকা হত এবং শ্রীপাঠ প্রসঙ্গ বেশীর ভাগ কলকাতারই বিভিন্ন জায়গায়। এক একদিন ২/৩ জায়গাতেও পাঠ করতেন—তাও কৃপা করে নিয়ে গিয়ে শুনিয়েছেন। পাঠের এমনই আকর্ষণ যে কলেজ বন্ধ হলেও কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে ইচ্ছা করত না—যদি বা কখনও যাওয়া হত, চিঠির মাধ্যমে শ্রীপাঠ প্রসঙ্গ লিখে পাঠাতেন কৃপা করে। সুদূর নীলাচল শ্রীধাম বৃন্দাবনেও তাঁর শ্রীপাঠ শুনবার সৌভাগ্য হয়েছে। দেখতাম শ্রীধামের সিদ্ধ মহাত্মা ভজনীয়া বৈষ্ণবগণ অধীর আগ্রহে তাঁর আগমন দিনটির জন্য অপেক্ষায় থাকতেন দাদার শ্রীমুখের অজস্র পীযুষধারা আস্বাদন করবেন বলে। শ্রীপাঠের শেষে তাঁদের আশীর্বাদী স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাদার শিরে বর্ষিত হোত—তাঁরা উল্লাসে বলে উঠতেন—"অপূর্ব অমৃত বর্ষণ করলে কেদার"।

কয়েকটি বছর আগে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে বেষাশ্রয় করেছিলেন। সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পরে নামকরণ হল শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দদাস বাবাজী মহারাজ। শ্রীকৃষ্ণভগবানের অভিন্ন কলেবর শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র—তাঁকে নিয়েই আনন্দ করেছেন। ভাগবতই তাঁর জীবন—ভাগবতই তাঁর প্রাণ তাই শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস—তিনি সার্থকনামা। সন্ন্যাসের পর তাঁর শ্রীমূর্ত্তি আরও তেজঃপুঞ্জ হয়েছিল। বহির্বাসধারী বৈরাগ্যের মূর্ত্তি দেখে মনে হত শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের দাসানুদাসের চেহারাই বটে।

শ্রীপাঠের পরে নিজের ঘরে বসেও দীর্ঘক্ষণ প্রসঙ্গ করতেন। কথা কইতে পারলেই তাঁর আনন্দ—কথা বলতে কখনও তাঁকে ক্লান্ত হতে দেখিনি। কি দাঁড়িয়ে কি বসে কি ঘরে কি বাইরে কি ট্রেনে বাসে অনর্গল ভাগবতী কথা—কথার ঝরণা—মধুস্রাবী। প্রশ্ন করতে জানলে তো খুবই খুসী হতেন। কথা দানে কোনও কার্পণ্য ছিল না। অকাতরে বিলিয়ে গেছেন—আমি অভাজন—আধার নেই পাত্র নেই তাই নেওয়ার সৌভাগ্য হল না। অপূর্ব স্মরণ শক্তি। শিশুকালের পাঠ্য জীবনের পড়া শ্লোক অনর্গল বলতে পারতেন পরিণত বয়সে। শ্রীমদ্ভাগবত তো কণ্ঠস্থ; শ্রুতিস্তুতির কঠিন কঠিন মন্ত্র অনায়াসে বলে যেতেন। গোস্বামিপাদগণের টীকার অপূর্ব ব্যাখ্যা, তার সঙ্গে তাঁর নিজের অনুভব মিশিয়ে এক অপূর্ব্ব আস্বাদন—এক অননুভূত রসের পরিপাটি। এমনটি আর হয়নি আর হবার নয়। বৈষ্ণবপণ্ডিত সমাজ তাঁর বিয়োগে যে রত্ন হারালেন তার স্থান কোনদিন পূরণ হবে না।

শ্রীপাঠ প্রসঙ্গে বাইরে বিভিন্ন স্থানে গেলেও সপ্তাহের মধ্যে রবিবার দিনটি শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে শ্রীপাঠের জন্যেই নির্দিষ্ট রেখেছিলেন। কারণ ছুটির দিনে সকলের আসার সুবিধা হবে।

তাই বুঝি রবিবার দিনটিই বেছে নিলেন তাঁর প্রকটলীলা সংগোপনের। প্রায় শ্রীপাঠের সময়টিতেই তাঁর মহাপ্রয়াণ—বেলা ৩-৪৫মিঃ তাঁর শ্রীগুরু পাদপদ্ম শ্রীল বাবাজী মহারাজকে শ্রীপাঠ শুনিয়ে আস্বাদন করাবার জন্যেই বুঝি এই নীরবে নিভৃতে প্রস্তুতি। তাঁর মহানির্য্যাণের খবর পেয়ে যখন শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে বিকেল ৪টা—৪॥ টার মধ্যে সমাগত হলেন অগণিত ভক্তবৃন্দ তখন মনে হল যেন তাঁরা তাঁদের চির অভ্যাস মত শ্রীপাঠ শুনবার আকর্ষণেই আশ্রমে ছুটে এসেছেন। সার্থক তাঁর রবিবারের শ্রীপাঠব্রতের উদ্‌যাপন। এই রবিবারটিই আবার তাঁর জন্মবারও ছিল—আবার তাঁর মহাপ্রয়াণের মহোৎসবের দিনটিও রবিবার—অপূর্ব যোগাযোগ।

দাদার প্রকটকাল ৭৭ বছর—গত অগ্রহায়ণে ৭৭ বছরে পদার্পণ করেছিলেন—শ্রীল বাবাজী মহারাজেরও প্রকট লীলা ৭৭ বছরের। শ্রীল বাবাজী মহারাজের তখন কৈশোরকাল—সেই সময়ই এক সাধু তাঁকে দেখে বলেছিলেন—"আরে আমার সাতাত্তুরে নিত্যানন্দ রে"। দাদা আমার এমনই শ্রীগুরু অনুগত যে সেই সাতাত্তরের গণ্ডী পার হলেন না। তার ওপরে গেলেন না। মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছিলেন এ বছরটি আর পার হবে না—তাই বারে বারে বলতেন—সাতাত্তর, দেখ কি হয়! শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে অপূর্ব নিষ্ঠা নিয়ে সারাটি জীবন শাস্ত্রচর্চা ভাগবত সেবা করেছেন। একদিনের ঘটনা তারই শ্রীমুখে শোনা। তাঁর নিজের ঘরে বসে শাস্ত্র দেখছেন, শ্রীল বাবাজী মহারাজ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেসা করলেন, কি দেখছ? দাদা উত্তর দিলেন 'দর্শনশাস্ত্র'। শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রশ্ন করলেন, দর্শন হয়েছে? দাদা নীরব রইলেন—শ্রীল বাবাজী মহারাজ কৃপা বর্ষণ করলেন—"লেগে থাক দর্শন হবে।" উত্তর জীবনে তার আশীর্বাণী সফল হয়েছিল। অপরিসীম পাণ্ডিত্যের আধার—যে কোন পণ্ডিত সমাজে মুকুটমণি—যেন মুকুটহীন সম্রাট—ইচ্ছা করলে গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করে রেখে যেতে পারতেন, কিন্তু এমনই গুরু অনুগত যে তা জীবনে করেন নি। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—"আদেশ নেই"—অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব যদি সাক্ষাৎভাবে কোনদিন গ্রন্থ রচনার আদেশ দেন তাহলে হবে। কিন্তু সে আদেশ পান নি। মনে হয় তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বিশেষ করে তাঁর অন্তরের অনুভব বুঝি প্রাকৃত কালি কলমের মাধ্যমে ধরা থাকবে না—তাঁর অভাবনীয় অনুভব তাঁর সঙ্গেই বিলীন হয়ে গেল। যেমন শ্রীল বাবাজী মহারাজের কীর্তন মাধুরী কোন যন্ত্রের মাধ্যমে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তাঁর কীর্তন পদ পদাবলী অপূর্ব অমৃতস্রাবী অক্ষয়রাজী গ্রন্থের মাধ্যমে ধরা আছে তাঁর 'শ্রীগুরুকৃপার দান' গ্রন্থে—কিন্তু শ্রীপাদের অপূর্ব কণ্ঠস্বর এবং সে বুকফাটা আর্তি তো ধরা নেই—তাঁর আর্তি তার সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। দাদা শ্রীপাঠবাড়ী টোলে অধ্যাপনা করেছেন—কত ছাত্রকে শিক্ষা দিয়েছেন, টোলের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র তৈরী করেছেন—পরীক্ষকের কাজ সুনিপুণভাবে করেছেন—শেষ পর্য্যন্তও যে কাজ করতে করতে তাঁর জীবনাবসান—কিন্তু নিজহাতে নিজের অনুভব গ্রন্থের মাধ্যমে রেখে গেলেন না। এ তাঁর লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার প্রতি অনীহা। চিরদিনই এর থেকে দূরে দূরে থাকতেন। তাই এ অভাব থেকেই গেল।

প্রায়ই দেখা যায় কঠিন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসিকতার সংযোগ কম। পাণ্ডিত্য যেন রসবোধকে শোষণ করে নেয়। কিন্তু আমার দাদাকে যাঁরা দেখেছেন—যাঁরা তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করেছেন তাঁরা জানেন—তাঁর সান্নিধ্যে যেতে কারো কখনও সঙ্কোচ বোধ হত না—শিশুর মত সরল, রসের খনি, কুসুমপেলব শুধু তাঁর তনু নয়—হৃদয়টিও। অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা উজাড় করে সমগ্র মনপ্রাণ যেন তাঁর শ্রীচরণে নত হতে চায়। হাসিতে, কথায়, কৌতুকে ভরিয়ে দিতেন সকলকে—যে যেমন—তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার। আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ বাদ যেত না—স্বভাবসুন্দর এমন মনের মানুষ বুঝি আর দ্বিতীয় মেলে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় বহুভাগ্যে তাঁর সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম, আবার ভাগ্যদোষে দুর্দৈববশে তাঁকে হারালাম।

এইবারে উপসংহারে তাঁর জীবনের ভজন আস্বাদনের একটি দিক নিবেদন করি—শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণ সিদ্ধান্ত করেছেন—ভগবানের নামের অক্ষর যেভাবে যেকোন ইন্দ্রিয় দিয়ে স্পর্শ করলেই নাম গ্রহণের ফল হবে। অঙ্গে যদি নামাক্ষর লেখা যায় তাতেও নাম গ্রহণের ফল। দাদা তাঁর পরিসর সুকোমলবক্ষে গোপীচন্দন দিয়ে উজ্জ্বলভাবে 'গোরা' নাম লিখতেন। দেখে মনে হত শ্রীমন্দিরে যেন রসের গোরা ভাবের গোরা বিলাসী গোরা ঝলমল করছে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এত নাম থাকতে 'গোরা' নাম লিখতেন কেন? এতে এত কি আস্বাদন? শ্রীল বাবাজী মহারাজ এর তাৎপর্য্য দেখিয়েছেন—এই 'গোরা' নামের ভিতরে স্বরূপ বলা আছে। গোবিন্দের 'গো' আর রাধার 'রা' দুই-এ মিলে নাম 'গোরা'। রাধাগোবিন্দ মিলিত মূরতি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর—'গোরা' নামই তা বলে দিচ্ছে। তাই গৌর ভজনীয়ার গৌর রসামোদীর এই গোরা নামে এত আস্বাদন! কিন্তু শাস্ত্রবিদ্ তো একটি প্রশ্ন তুলবেন। গোবিন্দের 'গো' এবং রাধার 'রা' এই নিয়ে যদি 'গোরা' নাম হয় তাহলে তো নাম গ্রহণের রীতি বজায় রইল না। কারণ রাধাগোবিন্দ নাম গ্রহণের নিয়ম হল আশ্রয় তত্ত্ব রাধারাণীর নাম আগে করে তারপর বিষয়তত্ত্ব গোবিন্দের নাম করতে হবে। তাহলে গোবিন্দ রাধা বলা যাবে না—রাধাগোবিন্দ বলতে হবে। কিন্তু 'গোরা' নামে তো তা হল না। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ তার রহস্য উদ্ঘাটন করলেন—এখানে 'গোরা' নামে যে গোবিন্দের 'গো' তিনি আসলে গোবিন্দ নন—তিনি বিবর্ত গোবিন্দ—অর্থাৎ রাধা গোবিন্দ মিলনের চরম দশায় জড়াজড়ি আছেন—তখন রাধারাণী গোবিন্দ ভাবতে ভাবতে গোবিন্দ হয়ে গেছেন—সুতরাং তিনি প্রকৃত গোবিন্দ নন—তিনি বিবর্ত গোবিন্দ—আবার রাধার যে 'রা' তিনিও প্রকৃত রাধা নন—বিবর্ত রাধা—গোবিন্দ রাধা ভাবতে ভাবতে রাধা হয়েছেন—এ রাধা হলেন বিবর্ত রাধা। তাই গোরা নামে বিবর্ত গোবিন্দের 'গো' (এই বিবর্ত গোবিন্দ হলেন আসলে রাধারাণী) এবং বিবর্ত রাধার 'রা' (এই বিবর্ত রাধা হলেন আসলে গোবিন্দ)—দুই-এ মিলে নাম 'গোরা'—তাহলে রাধাগোবিন্দের নাম গ্রহণের রীতিও বজায় রইল। তাই দাদা তাঁর বক্ষে এই 'গোরা' নাম অঙ্কিত করে রস আস্বাদনে ভরপুর হয়ে থাকতেন।

তাঁর কথা লিখে শেষ হবে না—বলে শেষ হবে না—ভেবে শেষ হবে না। অফুরন্ত তাঁর কথা। কারণ, তিনি যে কথার যাদুকর। অবিরল অশ্রুধারা নেমে আসে তাঁর স্মরণে। শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের একটি উজ্জ্বল দীপবর্তিকা চিরতরে নিভে গেল—আশ্রমকে অঁাধারে ভরিয়ে দিয়ে গেলেন। এর আগেও কয়েকজন গুরুভ্রাতা বিদায় নিয়েছেন। দাদার শ্রীচরণযুগলে ভূলুণ্ঠিত অশেষ ভক্তি-বিনম্র প্রণাম জানিয়ে এইটিই একান্ত প্রার্থনা—'তোমার রসের ধামে শ্রীগুরুগৌরপাদপদ্মতলে যে রস আস্বাদনে বিভোর হয়ে আছ, সেখান থেকে আমাদের প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি দিও—যাতে জীবনে তোমার মত শ্রীগুরু অনুগত হয়ে তাঁর মনের মত হয়ে চলতে পারি—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত যেন নামাশ্রয়ে থাকতে পারি।

পরিশেষে শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের অধিষ্ঠাতা প্রাণের প্রাণ স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এবং তাঁর অভিন্নতনু শ্রীল নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, আশ্রমের অধ্যক্ষ আমাদের পরম পুজনীয় পরমপ্রিয় শ্রীযুক্ত মদনদাদাকে (শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজ) দীর্ঘজীবী ও সুস্থ রাখুন এবং তাঁর যারা আনুকূল্য করেন—সকলকে কৃপা করুন যাতে শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের গৌরব চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আশ্রমবাসী সকলের কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করি!

—অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিযুগে মহাজন গৌরাঙ্গ আমার।
নাম দিয়া উদ্ধারিলা জগৎ সংসার॥
নাম সঙ্কীর্তন পথ ধর দৃঢ় করে।
ভাবিতে হবে না কিছু যাবে তুমি তরে॥

—ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

কৃষ্ণানন্দদাস বাবাজী মহারাজ স্মরণে

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাং ১৩৫০ সালের শারদীয়া পূজার সময় বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগে প্রবলঝড়, অজস্র বর্ষা ও সমুদ্র প্লাবনে পঞ্চাশ লক্ষের অধিক লোকের প্রাণনাশ হয়। তারপর মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূলভাগে সমস্ত ধান্যাদিশস্যের উচ্ছেদ হওয়ায় বহুলোক অনাহারে ও লতাপাতা প্রভৃতি খাওয়ার নিমিত্ত কলেরায় ও দুর্ভিক্ষে মারা যায়। সেই ব্যাপক কলেরায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষে ডিসেম্বর মাসে মদীয় মাতৃদেবী পরলোকগমন করেন। সেই সময়ে আমি ভবানীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্গত গদাধর আশ্রমে বৈদিক বিদ্যালয়ে নব্য ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নে রত ছিলাম। বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ীতে গিয়া আর মাতৃদেবীকে জীবন্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা শ্মশানে গিয়া তাঁহার দাহকার্য সম্পাদন করিয়া, মদীয় খুল্লতাতের উপদেশ হইল এখানে এখন ভয়ঙ্কর কলেরা, তুমি কলিকাতায় চলিয়া যাও, সেইখানে তোমার স্বর্গতা জননীর পারলৌকিক ক্রিয়াদি করিবে—তাঁহার সেই উপদেশানুসারে চলিয়া আসিলাম সেই ভবানীপুরে। কিন্তু অত্যন্ত দারিদ্র্য নিবন্ধন, ভবানীপুরেই আমার পূর্বপরিচিত ও আমার উপর স্নেহপরায়ণ একজন বৈষ্ণব ডাক্তার বলিলেন—এইখানে গজাননের [মারোয়াড়ী বড়লোক] বাড়ীতে আমি ভাগবত শুনিতে যাই, সেখানে আরও অনেক শ্রোতাও আসেন, তুমি সেখানে যেও আমি প্রস্তাব করিব ভাগবত পাঠ শেষ হইলে। আমি তাঁহার কথামত যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম সেই গজাননের বাড়ীতে। ডাক্তারবাবু সর্বসমক্ষে বলিলেন—এই ছেলেটীর মা মারা গিয়াছেন, ইহার খুবই দারিদ্র্য, আপনারা উহার মায়ের শ্রাদ্ধ কার্যের জন্য যে যাহা পারেন কিছু কিছু সাহায্য করিবেন। তখন অনেকেই সাহায্য করিলেন। তখন সেইখানে প্রথম কেদারনাথ রায় মহাশয়কে দেখিলাম এবং জানিলাম যে উনি পাঠবাড়ী হইতে আসিয়া মাঝে মাঝে গজাননের বাড়ীতে শ্রীমদ্ ভাগবতপাঠ করেন এবং ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে শোনান। আর একদিন আবার সেইখানে গিয়া দেখিলাম, তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা শেষ করিয়া বসিয়াছেন, "দীনেশ গুহ" [ইনি তখন দেওঘর বালানন্দ আশ্রমে ৺অনন্ত কুমার ন্যায়তর্কতীর্থের নিকট ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। খুব সম্ভব পূর্ব হইতে দীনেশ গুহের সহিত কেদারনাথ রায় মহাশয়ের পরিচয় ছিল] আসিয়া উপস্থিত। কেদারনাথ রায় মহাশয় দীনেশ গুহকে দেখিয়া বলিলেন—এবার আমি পুরাণের উপাধি পরীক্ষা দিব।

সেই সময় কিন্তু আমি কেদারনাথ রায় মহাশয়ের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনি নাই, কারণ তখন আমার মাতৃবিয়োগবশত কোন পাঠাদি শ্রবণের ইচ্ছা হয় নাই।

যদিও আমি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধ মহাপুরুষ বৈষ্ণবাচার্য রামদাস বাবাজী মহারাজের নাম কীর্তন শ্রবণ করিয়াছিলাম, তথাপি তাহা বরাহনগরে এক ভক্তের গৃহে সেই কীর্তন শ্রবণ করিয়া-

ছিলাম বলিয়া ভবানীপুরে কেদারনাথ মহাশয়ের দর্শনের পূর্বে পাঠবাড়ী দেখি নাই।

যাহা হউক, ইহার অনেক পরে সম্ভবতঃ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মাষ্টমী তিথিতে সন্ধ্যার একটু পূর্বে পাঠবাড়ী আশ্রমে উপস্থিত হই। সেইখানে উপস্থিত হইয়া আমার মনে হইল, যেন বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইয়াছি। খোলকরতাল বাদ্যের সহিত মধুরস্বরে নাম-সংকীর্তন চলিতেছে। (আশ্রমের) বাহির হইতে যখন আসিতেছিলাম, তখন সেই আশ্রমের বহির্ভূত স্থানগুলি সংসারীর ভোগক্ষেত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল। আশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়ায় আশ্রমের পরিবেশ দর্শন ও শ্রবণে আরও আশ্রমের বহির্ভূত স্থানগুলিকে স্পষ্টভাবে বিপরীত মনে হইয়াছিল। যাহা হউক সেই জন্মাষ্টমী তিথিতে পাঠবাড়ীতে বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী মহারাজ এবং কেদারনাথ রায় মহাশয় এই দুইজন আমাকে অতিশয় স্নেহভাবে আদরাদি করিয়া সেই রাত্রিতে সেইখানে থাকিতে বলিলেন। আমিও থাকিতে সম্মত হইলাম। বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী মহারাজ আমাকে একটু সরবত পান করিতে দিলেন। কেদারনাথ রায় মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার মাতৃকার্যাদি সাংবৎসরিকাদি নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে? আমি বলিলাম—হ্যাঁ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অবশ্য সেইদিন রামদাস বাবাজী মহারাজ পাঠবাড়ীতে ছিলেন না। শুনিলাম তিনি অন্যত্র কীর্তনে গিয়াছেন। ইহার পর আমি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে বেলুড় মঠে গিয়া থাকি। সেইস্থান হইতে মাঝে মাঝে প্রাণের টানে গঙ্গায় খেয়া পার হইয়া পাঠবাড়ীতে আসিতাম। যখনই পাঠবাড়ীতে আসিতাম তখনই পূর্বোক্ত ঐ দুই মহাপুরুষের [বৈষ্ণবচরণদাস বাবাজী এবং কেদারনাথ রায়] সহিত আমি দেখা করিতাম এবং আলাপ করিতাম। অন্যের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। মধ্যে মধ্যে বাবাজী মহারাজের দর্শন পাঠবাড়ীতে পাইতাম। তাহাকে প্রণাম করিলেই তিনি আমাদের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতিপ্রণাম করিতেন। কেদারদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবাজী মহারাজ এইরূপ করেন কেন? আমাদের তো বড়ই সঙ্কোচ হয়। তখন কেদারদা বলিলেন—উনি ব্রাহ্মণদের ঐরূপ প্রতিপ্রণাম করেন। আমাদের প্রণামে বাবাজী মহারাজ তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে দিতেন না। কেদারদা এবং বৈষ্ণবদা [আমরা পূর্বে এইভাবে উক্ত দুইজনকে ডাকিতাম] এই দুই জনের বড়ই মধুর সম্পর্ক ছিল। বাহির হইতে হঠাৎ বুঝা না গেলেও কার্য দেখিয়া বুঝা যাইত। যেমন—আমি একদিন পাঠবাড়ীতে গিয়া কেদারদার ঘরে বসিয়া আছি। বৈষ্ণবদা কেদারদার ঘরে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আমার পেটে একটা ব্যথা হয়" ইত্যাদি। তাহাতে কেদারদা বলিলেন—' তুমি বাবাজী, তোমার আবার অসুখ।" তখন কেদারদা ভেক নেন নাই। বৈষ্ণবদা তো বহু আগে থেকেই ভেক নিয়াছিলেন—সম্ভবত গোবর্ধন দাস বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে।

আর একদিন আমি পাঠবাড়ীতে গিয়া সেই কেদারদার ঘরে বসিয়াছি, সেদিন কি একটা উৎসব ছিল পাঠবাড়ীতে। বৈষ্ণবদা কেদারদার ঘরে গিয়া কেদারদাকে বলিলেন—যাও তুমি গিয়া একটু সভায় দেখাশুনা কর। তখন কেদারদা বলিলেন—আমার শরীর ভাল নয়। তখন বৈষ্ণবদা

বলিলেন— হাঁ। তুমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছ—আর এখন সভার কার্য দেখাশুনার সময় তোমার শরীর খারাপ। কেদারদা অনেক সময় বাহিরে নানাস্থানে শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে যাইতেন।

কোন এক সময় [সম্ভবত ১৯৫৫ কি ৫৬ খৃষ্টাব্দে] নিরঞ্জন স্বরূপ ব্রহ্মচারী বাংলা ভাষায় একটি ছোট পুস্তক ছাপাইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন—'চৈতন্য মহাপ্রভু অবতার নন ; কলিতে শেষে কল্কি ব্যতীত আর কোন দ্বিতীয় অবতার নাই।'' আমি সেই পুস্তক লইয়া গিয়া পাঠবাড়ীতে বৈষ্ণবদা ও কেদারদা দুইজনকে দেখাইলাম এবং বলিলাম, আপনারা ইহার খণ্ডন করুন। তখন দুইজনেই বলি- লেন "না, আমাদের তো নিষেধ আছে—বাবাজী মহারাজ নিষেধ করেছেন। আপনি খণ্ডন করুন, লিখুন, আমরা একটা পত্রিকায় ছাপাবো।" তখন আমি দুইজনকে মহাপ্রভুর অবতার বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহিলাম। কেদারদা একটি গ্রন্থ বাহির করিয়া আমাকে দিলেন। সেই গ্রন্থটির নাম আমার এখন মনে নাই। কিন্তু ঐ গ্রন্থে মহাপ্রভুর অবতার বিষয়ে বহু শাস্ত্র প্রমাণ আছে। আমি তাহা লইয়া লিখিলাম। উঁহারাও আমার লেখা একটি পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন।

রামদাসবাবাজী মহারাজের তিরোধানের পর—তাঁহার এক তিরোধান তিথিতে বৈষ্ণবদার আমন্ত্রণে আমি পাঠবাড়ীতে উপস্থিত হই। সেই বৎসর গ্রন্থমন্দিরের নীচে বাহিরে অর্থাৎ বারান্দায় সভা হইয়াছিল। সভার শেষে [তখন সভা ছোট করিয়া হইত] কেদারদা ভাগবত পাঠ করিতে বসি- লেন—উহাই আমার প্রথম তাঁর শ্রীমুখ হইতে ভাগবত পাঠ শ্রবণ। উহার পূর্বে আমি গদাধর আশ্রমে স্বামী বোধাত্মানন্দ [ভবমহারাজ] মহারাজের ভাগবত পাঠ শুনিয়াছিলাম। উনি সুন্দর ভাগবত পাঠ করিতেন। তবে একটু কঠিন বোধ হইত। যাহা হউক, সেইদিন কেদারদা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্মিত মুখে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টা ভাগবত পাঠ হইল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু ভাগবত পাঠ শুনিয়া আমি স্তম্ভিত ও আনন্দিত হইলাম যে, সন্ধ্যার সময় আমাদের সন্ধ্যা করার অভ্যাস থাকিলেও ভাগবতপাঠ শ্রবণ হইতে উঠিয়া যাইতে পারিলাম না। সেই পাঠের সাবলীলতা, মাধুর্য ও আনন্দ বিকীরণই আমাকে বসাইয়া রাখিল। মনে হইল কে যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে। এইরূপ ভাগবত তো আমি পূর্বে শুনি নাই। যদিও আমি পূর্বে খুব বেশী ভাগবত শুনি নাই, তথাপি যতগুলি শ্রবণ করিয়াছিলাম, সে সব কেদারদার ভাগবতপাঠের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছিল (আমার)।

তারপর আর একবার কেদারদা কি এক উৎসবে ঐখানেই ভাগবতপাঠ করিতে বসিলেন— তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আমি দাঁড়াইয়াই একটু শুনিয়া চলিয়া গেলাম। কারণ আমি বুঝিলাম যে যদি এখন শুনিতে বসি তাহা হইলে আর উঠিতে পারিব না। এইরূপ প্রায় অতুলনীয় ভাগবত পাঠ করিতেন কেদারনাথ রায়। অবশ্য ইহা অপর সকলেই জানেন। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, নানা

দৃষ্টান্ত ও ভাগবতের বহু শ্লোক এবং অন্যান্য শাস্ত্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া এমন সরল ভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত বলিয়া যাইতেন, শুনিলে মনে হইত তিনি ভাগবতময় হইয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রায় সমস্ত শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল ; অন্যান্য শাস্ত্রেরও বহু বাক্য ও শ্লোক তিনি অনর্গল ভাবে যথাস্থানে দৃষ্টান্ত দিয়া ইচ্ছামত উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন ।

কেদারদা একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে শ্রীমদ্‌ভাগবত নিয়াই থাকিতে বলিয়াছিলেন। হয়ত বাবাজী মহারাজের পূত আশীর্বাদে কেদারদা এইরূপ অতুলনীয় ভাগবত ব্যাখ্যার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এক সময় [অবশ্য অনেক পরে ১৯৭৭/৭৮ খৃষ্টাব্দে] আমি কেদারদার নিকট ভাগবত শ্রবণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন—আমি তো প্রায়ই পাঠবাড়ীতে থাকি না। বাইরেই অধিকাংশ সময় আমাকে ভাগবত পাঠে কাটাইতে হয়। আমি আর কি করিয়া আপনাকে ভাগবত পড়াইব। তখন আমি বলি, তাহা হইলে কাহার নিকট হইতে আমি ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিব? তখন কেদারদা বলিলেন—ঐ বৈষ্ণবচরণের নিকট থেকে শুনুন। আমি আরও অনেক পরে বৈষ্ণবচরণদার নিকট শুনিতে আরম্ভ করিলাম। তাও আমার এমন নানা বিঘ্ন হইতে লাগিল যে অধিকদিন দিন যাইতে পারিলাম না। কিছুটা শুনিয়াছিলাম। তারপর বৈষ্ণবচরণদা অপ্রকট হইলেন। আমার দুর্ভাগ্য।

আজ কেদারনাথ রায় [ইনি অপ্রকট হওয়ার প্রায় ৭/৮ বৎসর পূর্বে ভেক লইয়াছিলেন। নাম হইয়াছিল—কৃষ্ণানন্দদাস বাবাজী] তিরোহিত হইলেন। তিনি সদ্‌গুরু রামদাস বাবাজীর আশ্রিত সুতরাং তিনি হাসিতে হাসিতে তাঁহার ইষ্টদেবতার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গেল। শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে সংশয়াদি নিবারক পাইব না। এখন আমরা তাঁহাকে এবং তাঁহার শ্রীগুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা করি যেন তাঁহারা শ্রীমদ্‌ভাগবত বিষয়ে অর্থ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ করুন ।

—দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম

কৃপার জন্য যে সাধন তা হোল রোজকার,········
অনুকূল গ্রহণ আর প্রতিকূল বর্জন, এ হোল
কৃপাসিদ্ধের সাধন।

—শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বাবাজী

ভক্তির পরিমণ্ডলে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

পরম সাধক অশেষ শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ রায়—আমাদের কেদার-দার সঙ্গে আমার পরিচিতির সৌভাগ্য দেড় দশকের উপর। ১৯৭৫ সালে আমি যখন কলকাতা কর্পোরেশনে অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত, নানা সমস্যার সংকুলান করতে পর্যুদস্ত হওয়ার উপক্রম, সেই কঠিন সময়ে পাঠবাড়ী আশ্রম ও কেদার-দার সঙ্গে আমার সংযোগ। প্রথম পরিচয়েই কেদার-দা আপন করে নিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টতায় ও মহত্বে। তাঁর সান্নিধ্য ও মিতভাষ আমার উত্তপ্ত শরীরে ও অশান্ত স্নায়ুতে যেন এক সুগন্ধ ও শীতল মলম মাখাল।

তারপর ঘুরে ফিরে পাঠবাড়ী আশ্রমে গেছি। কোন উৎসবের প্রারম্ভে শান্ত সকালে ওখান-কার প্রাঙ্গণে গেছি, সংকীর্তন শুনেছি। প্রসাদ পেয়েছি। কখনো বৈকালিক আসরে কেদার-দা ও অন্যান্য মহাত্মাদের মুখে ভাগবত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনেছি। আশ্রমের অন্তঃস্থলে, যেখানে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৌকাবক্ষে পানিহাটি থেকে এসে রাত্রিযাপন করেছিলেন ও ভাগবত পাঠের শামিল হয়েছিলেন, সেই স্থানটিতে যতবারই যাই আর যতই দেখি আশ যেন আর মেটে না। পাঠ-বাড়ী প্রাচীন পুঁথি ও ধর্মগ্রন্থের সম্ভারে যে আপন নামের মাহাত্ম্য আজও বহন করে চলেছে. সমস্ত পৃথিবীর বৈষ্ণব অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভার অনেকখানিই এককভাবে বহন করে চলেছে সেটি বোঝার ও জানবার যতটুকু সুযোগ পেয়েছি, তাও ঐ মহান পাঠচালনার পুরুষ কেদার-দার জন্য।

আশীর দশক আসতেই আমি কার্যব্যপদেশে দিল্লীতে বদলী হলাম। তারপর পাঠবাড়ী আশ্রম কিংবা কেদার-দার সঙ্গে সংযোগ খানিকটা ক্ষীণ হয়ে এল। তবে সময় পেলেই আশ্রমে গেছি, রাজধানীতে গেলে কেদার-দা খবর দিতেন এবং তখনও দু-চার বার সাক্ষাৎ হয়েছে। এই মহাপুরুষের যে পরিচয়টি সর্বদা বড়ো বলে মনে হয়েছে সেটি এই যে উনি সাধন ভজন লোকশিক্ষা কথকতা যাই করুন না কেন, ওঁর সঙ্গে আমাদের সংশ্রব একেবারেই আপন জনের মতো অত্যন্ত ঘরোয়া ভাবে। যখনই কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি যে উনি আনুষ্ঠানিক বা বাহ্যিক রূপবিশিষ্ট নিছক এক ব্যক্তিত্ব। ওঁর চলাফেরা, কথাবার্তা, ভক্তমণ্ডলীর কাছে স্তুতি বা সেবা গ্রহণ করা সবটাই স্বাভাবিক, লৌকিকতাকে অহেতুক গুরুত্ব না দিয়ে।

আচার্য কেদারনাথ শাস্ত্রী ১৯১৩ সালে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মা সারদামণির পুত জন্মভূমি বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি গ্রামের অদূরে কোতুলপুরে তাঁর জন্ম। অপোগণ্ড অবস্থায় মাত্র এগার বৎসর বয়সে শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের কাছে তাঁর দীক্ষা—সাধন মার্গের প্রারম্ভ। এটি যে কতবড় আশ্চর্য ব্যাপার তা কেদারনাথ মহারাজের পরবর্তী জীবনে বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। এগার বৎসর বয়স থেকে তাঁর আশ্রম জীবন ও ভারতের নানাপ্রান্তে সুযোগ

পেলেই তিনি ভাগবততত্ত্ব, বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি ইত্যাদি পঠন ও প্রচার করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যে মহারাজ কাব্য-ব্যাকরণ, পুরাণ-তীর্থ শাস্ত্রের সকল অঙ্গে বুৎপত্তি ও স্বীকৃতি পান।

কেদারদা বিভিন্ন শাস্ত্রের—বৈষ্ণব অনুসারী ও অপর মতাবলম্বী—আপাতবিরোধী বক্তব্য-গুলিকে কত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করে সমন্বয় সাধন করতে পারতেন। সেটি তাঁর পাদপদ্মে বসে উপলব্ধি করার সুযোগ আমার হয়েছিল। কলকাতা ছাড়ার প্রাক্কালে তিনি আমার বালিগঞ্জের বাসায় এক সন্ধ্যায় এলেন এবং সীমিত স্থান ও আয়োজনের মধ্যে ভাগবতের যে সুললিত ব্যাখ্যা করলেন সেটি দর্শককুলকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মাঝখানে কঠোর শঙ্করপন্থী জনৈক প্রবীণ দর্শক তাঁকে জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের চুলচেরা বিচারে শঙ্কর ও রামানুজের বিতর্কের গভীরে নিয়ে যেতে চাইলেন। সেই পুরাতন যুক্তিবিস্তার অবতারণা—অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদ। আমার পন্থায় যদি শাস্ত্রের সারাংশ নিহিত থাকে, তবে অপর সব তত্ত্ব তো নিরর্থক, অসম্পূর্ণ। কেদারদাকে দেখলাম এই আলোচনা তাঁকে ডাইনে বাঁয়ে বিক্ষিপ্ত করতে পারল না। ঢেউয়ের উপর দিয়ে পাল তোলা নৌকার মত তাঁর সাবলীল পরিক্রমা। গন্তব্যস্থলে কতো সহজে ও মধুর ভাবে পৌছলেন। সেই সন্ধ্যাটি আজও আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে।

পাঠবাড়ী আশ্রম তথা কেদারদার সান্নিধ্যে আমার শেষবারের মতো যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল ১৯৮৫ সালে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের পঞ্চশত আবির্ভাব উৎসবে। এক বর্ণাঢ্য আয়োজন হয়েছিল। রাজ্যপাল উমাশঙ্কর দীক্ষিত, কলকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, শিক্ষক, ভক্ত, বৈষ্ণব, গায়ক-গায়িকা, সাহিত্যব্রতী বহু ধারার মিলন যেন দেখেছিলাম সেই সন্ধ্যায় পাঠবাড়ীর বিশিষ্ট উপকূলে। কেদারদা ছিলেন সমগ্র সম্মিলনের প্রাণবিন্দু।

প্রায় ৭০ বর্ষ ব্যাপী মহাপ্রভু ও রামদাস বাবাজীর ঐতিহ্য জীবন দিয়ে বহন করে আজ ৭৭ বছর বয়সে কেদারদা একই উদ্দেশ্যে পূর্ণাহুতি দিলেন আপন জীবন। তাঁর জীবন আমাদের অমৃতত্বে নিয়ে যাক। তাঁর মহান জীবনে আমাদের জীবনাদর্শ হোক চির উজ্জ্বল।

—শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার

চুপ কর, চুপ কর, ও কথা বলতে নাই। ওপরে দোষ পড়ে,
অঙ্গীকার যখন করেছে তার আগেই কৃপা পড়েছে। নিজের
স্বভাবের দোষে কৃপাভোগ হচ্ছে না, কৃপা ত সর্ব্বদাই হচ্চে,
তুমি নিজের স্বভাব কর্ম্ম ছাড়তে পারছো না।

— শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী

প্রথম সাক্ষাতে উপলব্ধি

খুবই সামান্য এক সরল ঘটনা, কিন্তু আমার কাছে হৃদয়স্পর্শী। ঘটনাস্থল পুরীধাম। ১৯৮৬ সালে শ্রীশ্রী৺হরিদাস ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষ্যে আমাদের শ্রীশ্রীধামে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদের দুদিন আগেই পেঁাছেছিলেন। উৎসবের আগের দিন ভোরে আমরা শ্রীধামে পেঁাছাই এবং ষ্টেশন থেকে আমাদের আশ্রম শ্রীশ্রী৺হরিদাস ঠাকুরের মঠের দিকে রওনা হই। সেখানে পেঁাছে আমাদের এক গুরুভাই কৃত্তিবাস মারফৎ জানলাম যে, গুরুদেবের ঘরের পাশেই একটা গেষ্ট হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। যাইহোক, পৌঁছানোর পরদিন বেশ সকালে গুরুদেবকে একান্তে পেয়ে কলকাতায় ধার্য কথা অনুযায়ী ওনার সঙ্গে উৎসবের পরদিন শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাওয়ার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করি। উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, "তুমি তো চাঁপা ফুল দেবে ?" একমুহূর্ত কিছু বুঝতে পারলাম না। তারপর মনে পড়ল আমি যখনই জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাই, তখনই চাঁপা ফুল নিয়ে যাই। কিন্তু বাবার (শ্রীগুরুদেবের) তো সেকথা জানার কথা নয়, আমি তো তাঁকে কখনও জানাইনি।

মন্দিরে যাবার দিন সকালে আমাদের ঠিক করা গাড়ী নিয়ে বাবার সঙ্গে শ্রীমন্দির অভিমুখে রওনা হই। মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমার আশা ভঙ্গ হোল। কারণ চাঁপাফুল নেই। ফুলওয়ালাদের কাছে আছে অন্য ফুল—পদ্ম। অনন্যোপায় হয়ে তাই নিয়ে অগ্রসর হলাম। বাবা আমাদের নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং শ্রীবিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলেন 'গোপীগীত' পাঠ। পরে শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করে রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করলেন আমারই হাত ধরে, যা আমার পরম আকাঙ্ক্ষিত। মূল মন্দির থেকে প্রাঙ্গণে এসে অন্যান্য বিগ্রহ দর্শন শেষে যখন বাবার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, তখনই দেখা পেলাম আমার প্রতীক্ষিত 'চাঁপাফুল' নিয়ে এক বিক্রেতাকে। বাবা সেই চিরাচরিত মধুর হাসিটি হেসে বললেন—"তোমার ফুল এসে গেছে। টাকা পাণ্ডার হাতে দিয়ে দাও। ও মালা কিনে বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দেবে।" এই বলে উনি গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডার হাতে মালা কেনার টাকা দিয়ে ফুলওয়ালার কাছ থেকে আরও পাঁচ ছটি ফুল নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবা যেদিকে বসেছিলেন, সেদিকের দরজা খুলে বাবার চরণপ্রান্তে সে ফুলগুলি দিয়ে বললাম,—"আমি তো আর কাউকে দেখিনি, চিনি না, তাই এই চরণেই এগুলো দিয়ে দিলাম।" শ্রীশ্রীগুরুদেব হঠাৎ একবার ভীষণ চমকে উঠে চোখ বন্ধ করলেন, তারপর একমুখ হেসে বললেন—"তোমার ফুল পৌঁছে গেছে।"

আজ বাবা কোন গোপন অভিমানে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। হয়তো তাঁর আজ্ঞা অনুসারে কিছুই করতে পারিনি। রেখে গেছেন কিছু স্মৃতি, যা আমার জীবনে চলার সম্বল। এই সব ঘটনার তাৎপর্য্য পর্যালোচনা করে আজও আমি মুগ্ধ হই, বিচলিত হই।

—কণিকা সিংহ

স্মৃতিচারণ

তিরস্কার যখন পুরস্কার হয়, মনে হয় এই তিরস্কার যেন যুগ যুগ ধরে শুনি। কখনও যেন না থামে। কিন্তু দুরন্ত কাল সব ছিনিয়ে নেয়, সব লণ্ড ভণ্ড করে দেয়। তা হোক। সব কেড়ে নিলেও নিতে পারে না মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটা। সর্বক্ষণের সঙ্গী হবার সৌভাগ্য-সূত্রে দেখতে পেয়েছি এই মহাপুরুষের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের কত রকম সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। সেই সম্বন্ধের টানে প্রতিদিন ছুটে আসতেন দলে দলে মানুষ। অবাক হয়ে দেখতাম, দুদিন আগেও যাকে দেখিনি শুনিনি তিনিই আজ তাঁদের পরম আত্মীয়। বিশ্বাস করুন, আপনাদের মত আমারও একটা সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে নিত্যদিনের সাক্ষী হিসাবে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আশ্রমবাসী সর্বজন হৃদয়গ্রাহী কীর্তনীয়া শ্রীযুক্ত সুবলদাস বাবাজী মহারাজ, আদ্যাপীঠ মঠের অধ্যাপিকা ব্রহ্মচারিণী শ্রীযুক্তা বেলা দেবী, যাদবপুর কলেজের সংস্কৃতের লেক্‌চারার শ্রীযুক্তা দুর্গাবতী ব্যানার্জী ও ডানলপ নিবাসী গুরুদেবের একান্ত অনুগত শিষ্য শ্রীযুক্ত পরিতোষ পাল মহাশয় এবং আরও অনেকে। বিশ্বাস না হয় একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন। তাঁরাই বলে দেবেন আমার সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ ছিল। নিঃসঙ্কোচে আজ আমার বলতে বাধা নেই, আমি ছিলাম তার অতি প্রিয় "গবেট" ছাত্র। শিষ্য ও অনুরাগীমণ্ডলীর মধ্যে আমার এই "গবেটত্ব" গুণের প্রশংসায় যখন পঞ্চমুখ হতেন, সকলই অনুভব করতেন, এই নামে ডেকে আমাকে সর্ব্বজনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতেন—তা নয়। আসলে আমার প্রতি তার গভীর ভালবাসা ভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রকাশ। অন্যেরা না ভাবলেও আমি কিন্তু মনে মনে এই নামের সাদৃশ্য খুঁজে পেতাম। কারণ আমি তার গভীর ভালবাসার ও প্রত্যাশার যোগ্য বিনিময় দিতে পারিনি। দীর্ঘ ৯/১০ বৎসর তার পাদপদ্মের ছায়ায় ২৪ ঘণ্টা সংস্কৃত শিক্ষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন তার সারাজীবনের সাধনলব্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় উপলব্ধি ও অনুভূতি যা করতে পেরেছেন, সেই সকল সম্পদ আমার মধ্যে রেখে যেতে, যাতে তাঁর অবর্তমানে সেই ধারা অব্যাহত থাকে। আমি তাঁর প্রত্যাশা পূরণে অক্ষম হই। যখন বুঝতে পারলেন আমি এই মূল্যবান সম্পদ ধরে রাখবার যোগ্য পাত্র নই, তখন থেকেই রাগে দুঃখে এই "গবেট" নামে অভিহিত করেন। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, অযোগ্য বলে তিনি কখনও দূরে ফেলে দেননি। শ্রীমদ্ভাগবত পড়াতে ও শ্রবণ করাতে বঞ্চিত করেননি। লক্ষ্য করেছি, যখনই কৃতিমান ছাত্র-ছাত্রীরা ভাগবত পড়তে এসেছেন সেই সময় এই "গবেট" কোন কারণে উপস্থিত না থাকতে পারলে পরে বহু তিরস্কার শুনতে হত। যেখানে যেখানে পাঠ করতে যেতেন, সুযোগ থাকলে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলেননি। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র প্রাণ। কার্য্যকারণে কৃতীমান ছাত্র-ছাত্রী গুণিজনের অভাব ঘটলে এই "গবেট"কেই শ্রোতা ও ছাত্র হিসাবে সঙ্গী করে নিতেন। শাস্ত্র

রস ও ভালবাসার রসিকতায় দুইজনে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতাম। তখন তাঁকে পেতাম এক ভিন্ন স্বরূপে। সেই স্বরূপটা ছিল আমার একান্ত নিজস্ব। পরক্ষণেই লোকজন আসতে শুরু করলে আমি যেইকে সেই 'গবেট' হয়ে যেতাম। হাজার হাজার শিষ্য ভক্ত অনুরাগী জনের মধ্যে নাতি হিসাবে এমন মধুর সম্ভাষণের ডাক কয়জনের ভাগ্যে ঘটেছে জানি না। এই হিসাবে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। দুঃখের বিষয় এই নামে ডাক আর কোনদিনই শুনতে পাব না। "গবেট"কে ডেকে কেই বা আর অমৃতময় ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা শ্রবণ করাবেন। (আজ যে আমি গবেট হীন অগবেট হলাম)। তাই তাঁর চরণে প্রার্থনা জানাই জন্ম জন্মান্তরে গবেট হয়েই যেন তোমার কাছে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করতে পারি। এর বেশী আর কিছু চাই না। আমার একটা দুর্নাম ছিল, "আমি শ্লোকের ব্যাখ্যাতে জল মেশাই" অর্থাৎ ভুল ব্যাখ্যা করি। আজ আমি হলফ্ করে বলতে পারি—আমার এই লেখাতে এতটুকুও জল মেশাইনি। যা সত্য তাই লিখেছি। আশা করি আমাকে আর কেউ দুর্নাম দিতে পারবে না।

—নীহার দাস ব্যাকরণতীর্থ

"ভগবানে যা আছে তা কৃপা। সেই কৃপা ভক্তের ভজন আগুনে পাক হয়ে ভক্তি নাম ধরে ভগবানের কাছে ফেরত যায়।"

—শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী

শ্রীল কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের গুণগাথা কথা

শ্রীভগবৎ কারুণ্যঘন বিগ্রহ শ্রীভগবদ্‌ভিন্ন তনু শ্রীগুরুদেব জীবদুঃখে কাতর হইয়া জীবসকলকে পরমানন্দ দানে চিরকৃতকৃতার্থ করিবার জন্য অনাদিকাল হইতে এই নশ্বর ধরাধামে বিচরণ করিয়া আসিতেছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণে দেখিতে পাই—

এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত হয় ভক্তিরস পাত্র॥

শ্রী সাধুগুরু বৈষ্ণব ভগবৎ কারুণ্যঘন ভক্তিময় বিগ্রহ। আমাদের পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বাবাজী মহারাজের করুণার দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম করুণার অবদান—"শ্রীগুরু কৃপার দান" গ্রন্থখানি। এছাড়া তাঁহার বহুমুখী কৃপাদানের মধ্যে ভাগবত চতুষ্পাঠী ও শ্রীগ্রন্থ মন্দির অন্যতম।

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীভাগবত চতুষ্পাঠীর কৃতিমান ছাত্রদিগের মধ্যে—
দুই মূর্ত্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য: ১) পণ্ডিত শ্রীল বৈষ্ণবচরণ দাস পঞ্চতীর্থ
২) পণ্ডিত শ্রীল কৃষ্ণানন্দ দাস কাব্যব্যাকরণ পুরাণতীর্থ

ইঁহারা উভয়েই শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের চরণাশ্রিত ছিলেন। উক্ত শ্রীভাগবত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পদে উভয়েই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীল কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ সর্বজনবিদিত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ছিলেন। এক কথায় বলা চলে, তিনি ছিলেন ভাগবতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা। ভারতবর্ষের বিদ্বৎমণ্ডলীর উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য। তাঁহার ভাগবত পরিবেশনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞানী গুণী সজ্জনমণ্ডলী খুবই লুব্ধ হইয়া আগ্রহাতিশয্যে ভাগবতী কথা শ্রবণে সাতিশয় আনন্দ ভোগ করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার ভাগবতী কথার পরিবেশনায় বৈশিষ্ট্য ছিল। ভাগবতীয় তত্ত্ব নিরূপণে ভাগবতের টীকাকারগণের টীকা 'চূর্ণিকা' উত্থাপনপূর্বক জটিল সিদ্ধান্তসমূহ সহজ সরল করিয়া ঐ ভাগবতীয় প্রমাণে পরিবেশন করতঃ আমূর্খ বিদ্বানমণ্ডলীর চিত্ত বিনোদন করিয়াছিলেন। মাননীয় কলিকাতার পণ্ডিত সভার প্রাক্তন ও বর্তমান স্বনামখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর পরমশ্রদ্ধাভাজন তিনি হইয়াছিলেন।

মাননীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ এমন বক্তব্য রাখিয়াছিলেন, আমাদের পণ্ডিতসভার পরমভূষণস্বরূপ শ্রীল কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীকেদারনাথ রায় কাব্যব্যাকরণ পুরাণ তীর্থ) অষ্টাদশ পুরাণের মুকুটমণির শ্রীমদ্ভাগবতের অশ্রুতপূর্ব বক্তা। বাস্তবিকই শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে বহু

স্থানে জটিল রহস্যময় ব্যাসকূট আহৃত।

পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের ব্যক্তিগত জীবন সহজ সরল ও নীতিপূর্ণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তাঁহার আদর্শময় নীতিবান জীবন গঠন করিয়াছিলেন। আরও কত কথা, কথার কি কোন শেষ আছে? তাঁহার গুণগ্রামের সেবা করা মাদৃশ-অভাজন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার কথা যখনই মনে হয় তখনই আমার বেদনাময় জীবন উদ্বেলিত হইয়া আমাকে স্তব্ধ করিয়া রাখে। তাঁহার শ্রীভাগবতী পাঠের পরিপ্রেক্ষিতে এ হতভাগ্যজন ছায়ার মত পিছু পিছু ছিল। তাঁহার শুভেচ্ছারূপ তিরস্কারময় জীবন আমার। তাঁহার উপদেশামৃতের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে একদিন আমায় বলিয়াছিলেন, "বলতে পারেন তিরস্কারের পাত্র কে?" আমাকে নির্বাক দেখিয়া নিজেই সমাধান করিলেন, "যাকে অতিশয় ভালবাসে সে।" আজ তাঁহার বিরহে এই দুর্দিনে সেই ভালবাসার মূরতিখানি সর্বদা আমার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া থাকুক।

—হরিচরণ দাস বাবাজী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

নামাচার্য্য রামদাস বাবাজী মহারাজের কৃপাধন্য শ্রীকেদার নাথ রায় (কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ) গত ১৫ই বৈশাখ ১৩৯৭ ইহধাম ত্যাগ করে নিত্যধামে প্রবেশ করেছেন। গত ২৫ বৎসরের অধিক আমার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। দেখা হলেই বলতেন—"ভাই, কেমন আছ?" আমি বলতাম—"কিছুই তো হ'ল না।" তিনি বলতেন—"সদ্-গুরু পেয়েছো, সময় হলেই ফল ধরবে।" আজ তিনি আর ইহজগতে নেই এটা ভাবতেই পারছি না। শান্ত, সরল, উদারচিত্ত এই মহাত্মাকে দর্শন করলেই হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আকর্ষণ জেগে উঠত। তাঁর স্মৃতিচারণ লিখতে গিয়ে আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বেঁচে থাকবেন অগণিত ভাগবত-প্রেমিকের হৃদয়ে, তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের মাধ্যমে। এই অদ্ভুত ভাগবত-পাঠক, পাঠক-জগতে খুবই বিরল। হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর পাঠ শুনতেন। কারণ এই জাতীয় পাঠক সারা পশ্চিমবঙ্গে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তিনি হাজার হাজার শিষ্য, ভক্ত, অনুরাগী রেখে গেছেন, তাদের হৃদয়ে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাই নিতাই-গৌরের শ্রীচরণে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

—পণ্ডিত হিমাংশু চক্রবর্তী

আমাদের অধ্যাপক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ স্মরণে

অনেকে তাঁর কথা লিখছেন দেখে লেখা দেবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু লিখতে গেলেই যে কথা বিশেষভাবে মনে হয়, তা হলো, তাঁর সম্বন্ধে কিছু না বলাই বোধ হয় ভালো। কেন? না, আমরা যাই বলব তাই ঠিক বলা হবে না। তাই কিছু না বলাই বোধহয় অনেক কিছু বলা। যেন সেই সীমাহীন সমুদ্রের দিকে, সেই গগনচুম্বী পর্বতের দিকে, সেই দিগন্তপ্রসারী দিক্‌-চক্রবালের দিকে কেবল তাকানো ছাড়া আমাদের বলার কিছু কি থাকতে পারে?

এই তো সেদিনের সেই সন্ধ্যা যা ধ্রুবতারার মত স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করছে। সেদিনই ছিল তাঁর কাছে আমার শেষ পাঠ নেওয়া। তখন যা বিন্দুমাত্র বুঝিনি।

পরিতোষদার বারান্দায় উচ্চ আসনে তিনি বসে আছেন—একদিকে সুবলদা, অন্যদিকে আমরা দুজন অর্থাৎ আমি ও দুর্গাদি। পরিতোষদা তো ছিলেনই, কয়েকজন ভক্ত মহিলাও ছিলেন।

পাঠ শুরু হোলো। শ্লোকটি পাঠ হতেই তিনি বললেন, ভাগবত ভীষ্মকে যা বলেছেন এরকম কোথাও বলা হয়নি। কথাটা কি? না, ভীষ্মকে ভাগবত বলেছেন যেন স্বর্গের দেবতা মর্তে নেমে এসেছেন।

আজ মনে হয় তিনিও যেন মর্তের নন। তিনি যেন কোন্ লীলাজগতের একজন হয়ে আমাদের কাছে নেমে এসেছেন—আমাদের ভাগবতী কথা শোনানোর জন্য।

মানুষ হ'লে এইরকমভাবে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অনর্গল ভাগবতী কথা বলতে পারেন! এতে যেন তাঁর কোন ক্লান্তি নেই! যেন বলাতেই তাঁর আনন্দ। ভাগবতী কথা বলতে গিয়ে তাঁর কি অনির্বচনীয় ভাব! কি অলৌকিক হাসি!

তাঁর পাঠের কি অলৌকিক আকর্ষণ। যেন তিনি যাদুকর—আমাদের সকলের মনকে নিয়ে যান সেই স্থানে যেখানে শুকদেব গোস্বামী প্রায়োপবেশনে নিবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভাগবত উপদেশ করছেন। সেই সেই বরণীয় যোগী ঋষিদের মাঝে আমরাও যেন ঠাঁই পেয়েছি!

আবার যেন তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। আমরা যেন চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছি! আমরাও যেন সেখানকার! পাঠের সময় আমরা যেন তাঁর হাতের পুতুল হয়ে গেছি! ইচ্ছামত ভাঙ্গছেন, গড়ছেন—ইচ্ছামত যেখানে খুশি নিয়ে যাচ্ছেন!

তাঁর ঘরে আমরা যে ক'জন দীর্ঘক্ষণ তাঁর সঙ্গ করেছি—আজ আমাদের তাঁর অভাবে কি যে হাহাকার, কি যে প্রিয়জন হারানোর ব্যথা তা কি ভাষায় বলা যায়!

সেইদিন ভীষ্মের স্তুতি পাঠ হলো। তাঁর শ্রীমুখে যা শুনেছি তা আমাদের চরম পাথেয়।

প্রথম থেকেই ওনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। দীর্ঘদিন শুনেছি পাঠবাড়ীতে কেদারনাথজী ভাল ভাগবত পাঠ করেন। কিন্তু ওনাকে তখন জানতাম না। ওনাকে দেখে প্রথম দিকে আমার যা মনে হয়েছিল তা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না।

এইরকম মনে হলো—লোকটি তো বেশ! রাধা সাজালে বেশ ভালই মানাবে!

সেদিন যে চিনতে ভুল হয়নি—আজ মর্মে মর্মে তা মনে হয়। ওনার কাছে পাঠ নিয়ে মনে হয় তাঁর কাছে ভাগবত যেন মূর্তিমান হয়েছেন। যেমন ভীষ্মের কাছ থেকে বেরিয়ে আসছে পরশুরামের দেওয়া অস্ত্র অভিনবরূপে—যার সম্মুখে পরশুরাম দাঁড়াতে পারছেন না। যেমন শ্রীশুকদেবের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ব্যাসদেবের শেখানো ভাগবত অতুলনীয়রূপে, তেমনিভাবে শ্রীধরস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ যা যা বলেছেন তা তার শ্রীমুখ থেকে বেরিয়ে আসছে অভিনবরূপে, অতুলনীয়রূপে। যেন আমরা নূতন কথা শুনছি!

আমার পিতামহ ৺পশুপতি ভট্টাচার্য্য ছিলেন একজন বিখ্যাত ভাগবত পাঠক। কিন্তু পিতামহের কাছে পাঠ নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ইচ্ছা ছিল কৃষ্ণানন্দ দাসজীর কাছে পাঠ নেওয়ার কিন্তু তা সম্পূর্ণ হোল না। ইচ্ছা করলেই তো সব হয় না। যা পেয়েছি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর উপায় কি! এই অধম ছাত্রের প্রতি তাঁর কৃপা অলক্ষ্যে বর্ষিত হোক—এইটুকুই প্রার্থনা।

—শ্রীহরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভক্তি ভগবানের সম্পত্তি নয়,
ভক্তি ভক্তের সম্পত্তি।

—শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মধুচাকে মধু থাকলে মধুকর আসে ও মধুপানে মত্ত হয়ে গুণ গুণ স্বর করে। এই গৌর-নাচা ভূমি, শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের নয়নজলে সিক্ত এই ভূমি, কত শত মহাপুরুষের পদাঙ্কিত এই ভূমি, এখানে স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর শ্রীভাগবতাচার্য্যের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত কথারূপ মধুপান করে মত্ত হয়ে ৯ঘণ্টা নৃত্য করেছিলেন এবং তিন দিন অবস্থান করেছিলেন। এই পাঠবাড়ী ভূমির মত মহিমা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নেই, কারণ এখানের ভাগবত কথারূপ মধুপানে স্বয়ং ভগবান মত্ত হয়েছেন। তার ৪০০ বৎসর পরে নামাচার্য রামদাস বাবাজী মহারাজ কলিহত, সর্ব-সুকৃতি-বঞ্চিত কলিজীবকে নিতাই গৌর কীর্তন রূপ মধুদানে মত্ত করেছিলেন। যাঁর মধুদান বিশ্বের ইতিহাস। তিনি অপ্রকটের পর তাঁর সুযোগ্য সন্তান ১০৮ শ্রীপাদ্ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ (কেদার নাথ শাস্ত্রী) বহু বৎসর ধরে জ্ঞানী অজ্ঞানী দীন হীন জনে তাঁর শ্রীগুরুদেবের আদেশে মধুদান করে শুক্লা পঞ্চমীতে মধুর চাক নিয়ে শ্রীগুরুধামে চলে গেছেন। তাঁর শ্রীমুখে যাঁর শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার সৌভাগ্য হয়েছে, তিনি বুঝেছেন শ্রীকৃষ্ণকথা, গৌরকথায় কত মধু। তাঁর কাছে কতো কতো গুণী মধুকর আসতেন, মধুপান করে নিজেকে ধন্য করতেন। তাঁর শ্রীমুখ হতে কৃষ্ণ ও গৌররূপ মধু প্রবাহিত হতো। রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, নিতাইতত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব, শ্রীগুরুতত্ত্ব, নাম-মাহাত্ম্য, 'বৈষ্ণবমাহাত্ম্য, প্রসাদমাহাত্ম্য, ধামমাহাত্ম্য, এই ধারাগুলি নিরন্তর প্রবাহিত হতো শত শত ধারে। কি আহারে, কি বিহারে, দিবানিশি সর্বক্ষণ এই তত্ত্ব রূপ মধুধারা মধুকরদিগকে অকপটে দান করে গিয়েছেন। যাঁরা তার শ্রীমুখে গৌর গোবিন্দ কথারূপ মধুপান করবেন, তিনি যেন তার কত আপন। তার কাছে আপন পর ছিল না, সকলকে তিনি সমানভাবে আদর করতেন। আর সকলকে তিনি বলতেন—"ভাগবত পড়, নইলে ভাগবত কথারূপ মধু হতে বঞ্চিত হবে।"

আপামর জনসাধারণ সকলেই তাঁর শ্রীমুখের ভাগবত মধু পান করেছে। একমাত্র বাকি পড়ে রইল—এই অহংকারী অভিমানী তাঁর অযোগ্য সন্তান।

চরণাশ্রিত শান্তি

"পরমপবিত্র আত্মা ভারত-তপন।
মধুর গৌরাঙ্গপ্রভু সোনার বরণ॥

—দীনবন্ধু মিত্র

চিরজীবী হউন

ভক্তি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞার সমন্বয় কদাচ দেখা যায়। যাঁদের মধ্যে ঐ ত্রিবিধ গুণের সন্নিবেশ হয় তাঁরাই মনুষ্য জীবনে মহত্ত্বের আখ্যা লাভ করেন, নশ্বর জীবলোক থেকে অমরত্বে উত্তীর্ণ হন। পার্থিব মায়াপাশে আবদ্ধ স্বার্থচিন্তামগ্ন বিষয়বিষে প্রপীড়িত জীবজগৎ তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণে সাধনোচিত মার্গের সন্ধান লাভ করে।

কেদার প্রভু ছিলেন এমনই এক মহাত্মা যাঁর মধ্যে ঐ ত্রিবিধ গুণের সহাবস্থান আমরা লক্ষ্য করেছি। অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ে আলোচনাকালেও তাঁর প্রজ্ঞা ও ভক্তির ব্যাপ্তি অতি সহজেই উপলব্ধি করা যেত। ভাগবত কথা বর্ণনাকালে ব্যাসাসনে তিনি যেন সেই ঋষিতুল্য বলেই প্রতিভাত হতেন। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী সুললিত কণ্ঠস্বরে এক নূতন মাত্রা পেত। জাগতিক পাপতাপ নিমেষে কোথায় যেন অন্তর্হিত হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে চলে যেত তাঁর বোধ থাকত না। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে এই একাত্মীকরণের অদ্ভুত এক ক্ষমতা আমরা প্রভুর বক্তৃতায় লক্ষ্য করতাম। দুরূহ তত্ত্বকে ; কেমন প্রাঞ্জল করে সহজ সরল উপমার সাহায্যে কর্ণের ভেতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করিয়ে প্রাণমনকে আকুল করে দিতে পারতেন তিনি। কৃষ্ণকথা এবং গৌরকথা একাকার হয়ে এক ঐশ্বরিক ভক্তির উন্মেষ ঘটাত ; তখন মনপ্রাণ যেন একই সুরে ঝঙ্কৃত হত। মানবপ্রেমে মন আকুলি বিকুলি করত। তনু-মন-প্রাণ দেবচরণে সঁপে দিয়ে সমাজে বিপথগামী বিষয় চিন্তাকুল জীবকে সাধনমুখী করার বাসনায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করে চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে মন ধাবিত হত। এখানেই তো ব্যাখ্যাকর্তার চমৎকারিত্ব। এটাইতো তাঁর জীবনেরও চরম-পরম লক্ষ্য। আপন বিনয়ে সদাই তাঁর মধ্যে জ্ঞানান্বেষী ছাত্রসুলভ অনুসন্ধিৎসা দেখা যেত। তিনি তার মধ্যে থেকেই আপন প্রজ্ঞায় অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে মীমাংসা সূত্র বার করে দিতেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থগুলো পাঠকালে এখনও সেই সুমধুর কণ্ঠের ধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। তাঁর জ্ঞানের পরিধি মাপা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মানবের সাধ্যাতীত ; তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শুধুমাত্র বৈষ্ণবদর্শন বা বৈষ্ণব সাহিত্যই নয়, অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রেও তাঁর যে সুগভীর ব্যুৎপত্তি ছিল সেটা অতি সহজেই বোঝা যায়।

তিনি যে পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন সেই সাধনমার্গ ধরে আমরা যদি নিয়ত অনুশীলন করি তাহলে জাগতিক ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগে মনের প্রসারতা ঘটবে এবং শ্রীগৌরচরণ প্রাপ্তিতে মনকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করতে পারবো। আর আমাদের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মহারাজ চিরজীবী হয়ে আমাদের সংগে বিরাজ করবেন।

—শ্রীশুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত, নবদ্বীপ

"যাহ ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে"—

ভাগবত পাঠ তো অনেকেই করেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের মত ভাগবত পাঠ ক-জন করতে পারেন? কেনই বা হবে না? শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ যাঁর প্রভু, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মহাশয় যাঁর শিক্ষাগুরু, মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ভূমি শ্রীল শ্রীভাগবত আচার্য্যের পাঠবাড়ী যাঁর বাসস্থান, তিনি যে প্রকার সুনাম অর্জনে সক্ষম হবেন সেই ধরণের সুনাম অর্জন করা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? পরিবেশ মানুষের জীবনকে, শিক্ষাকে, ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে সহায়তা করে।

প্রথম যেদিন তাঁর পাঠ শুনলাম সেদিন তিনি একটি ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করে বলছেন—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥"

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপর যুগে পরিচর্যার মাধ্যমে মানুষ পরমার্থ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কলিযুগে কোন প্রকার সাধন না করেই কেবলমাত্র হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমেই সেই একই জাতীয় পরমার্থ লাভে অনায়াসেই সক্ষম হবে।

কেবলমাত্র নাম মহিমাই তাঁর মুখে শুনিনি, শুনেছি ভক্তচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, অজামিলের কথা, আবার ভক্তিলাভের উপায় হিসাবে তিনি বলেছেন—নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পদধূলি ব্যতীত ভক্তি-লাভ অসম্ভব। আবার তিনি পাঠে বলতেন, রাজা পরীক্ষিৎ কেমন করে শুকদেব গোস্বামীর কাছে হরিনামের উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেকটি ঘটনা তিনি ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করতেন। অতি অদ্ভুত বাচনভঙ্গী—যা ভাষায় প্রকাশ করতে আমার লেখনী অক্ষম।

গৌরমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল সর্বত্রই তিনি সারা জীবন ধরে শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণপূর্বক গৌরনাম তথা হরিনাম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। যখন যে স্থানে যে লীলা বাবাজী মহাশয় ভোগ করেছিলেন, সেই স্থানে সেই লীলার অদ্ভুত শাস্ত্র প্রমাণ যথা চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, ভক্তচরিত্র, ব্রহ্মসূত্র, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সেই গৌরলীলা, কৃষ্ণগুণগাথা, ভক্তচরিত্র শ্রবণ করে বহু মায়ান্ধ জীব অতি সহজে ভক্তিপথে অগ্রসর হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

আবার যখন তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধারমণ চরণদাস দেবের স্মরণ মহোৎসবে রাধারমণচরিত সম্বন্ধে বলতেন, তখন মনে হতো আমরা প্রত্যক্ষ চরণদাসজীকে দেখতে পাচ্ছি। অনুরূপভাবে শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের মহতী সভায় তাঁর ভাষণ শোনার জন্য গভীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করতাম।

অসুস্থতার জন্য যখন তিনি গৌরমণ্ডল কিংবা ব্রজমণ্ডলে যেতে অক্ষম হয়েছেন তখন সেখানকার ব্রজবাসীগণ, গৌরভক্তগণ আক্ষেপ করে বলেছেন, "আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এ বৎসর আমরা গৌরকথা শোনা থেকে বঞ্চিত হলাম।"

একদিকে তিনি ছিলেন পরম পণ্ডিত, শাস্ত্রবিশারদ, অন্যদিকে তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ভাগবত বক্তা, পরম শ্রদ্ধেয়, চিন্তাশীল, বিচক্ষণ, নিষ্ঠাপরায়ণ মহৎ ও সুতার্কিক। দেখতে ছিলেন ভাবগম্ভীর, কিন্তু সচ্চিদানন্দময় মূর্তি। যখন কারও প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাতেন তখন মনে হতো একটা বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ এক নিমেষের মধ্যে চমক্ দিয়ে চলে গেল। অপূর্ব তাঁর সিদ্ধান্ত। যে কেহ যে কোন কঠিন প্রশ্ন কিংবা সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে আসুন না কেন অতি সহজে, অতি অল্প কথায় সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত করতেন, যা ছিল সন্দেহাতীত।

আমি মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম। কখনও বা সমস্যা সমাধানের জন্য, কখনও বা নিছক দেখতে। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বললাম, "আচ্ছা, বাড়ীতে যদি বেশী তুলসী গাছ হয় তাহলে কি হয়?" উত্তরে একটু মৃদু হেসে বললেন, "কৃষ্ণতুলসী না সাদা তুলসী"? বললাম, 'কৃষ্ণতুলসী ও সাদাতুলসী উভয়েই।' বললেন 'কত হবে? আড়াইশোর বেশী?' বললাম 'তা হবে'। বললেন, 'ঈশ্বর প্রসন্ন।' বললাম, "বুঝব কেমন করে?" বললেন, "হরিনাম যজ্ঞ হবে।" আবার বললেন, "প্রত্যহ তুলসীগাছে জল দিস?" বললাম "হাঁ দিই।" বললেন, "মন্ত্র বলে দিস?" বললাম, "মন্ত্র জানি না।" বললেন 'আগামী কাল আসবি। মন্ত্রটা শিখিয়ে দেব।' পরের দিন সকাল নটায় ঘরে গেলাম। পাশে আদিত্যদাকে বললেন 'পেনটা দে'। একটা কাগজে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে কাঁপা হাতে মন্ত্রটা লিখে দিলেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে তিনি আমার শ্রীগুরুদেব। কারণ "এক অক্ষর শিখায় যে, জন্মে জন্মে গুরু সে।"

অপ্রকটের অল্প কয়েকদিন পূর্বে আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, "বলুনতো আগে আপনার কাছে আসতে ইচ্ছা হতো না, কিন্তু এখন কেন হয়?" বড় চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন, বললেন, "ওরে আগে আমি রাজা ছিলাম তাই আসতে ইচ্ছা হতো না। এখন আমি কাঙ্গাল হয়েছি তাই আসতে ইচ্ছা হয়।" মনে হলো যোগ্য প্রভুর যোগ্য শিষ্য। কাঙ্গাল রামদাস, তাঁর শিষ্য কখনও রাজা কৃষ্ণানন্দ দাস হতে পারেন? তিনি তো কাঙ্গাল হবেনই।

১৫ই বৈশাখ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে যখন পাঠবাড়ী আশ্রমে যাই তখন দেখলাম গ্রন্থমন্দিরের সামনে বেশ কিছু মানুষ দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে প্রশ্ন, হঠাৎ এঁরা এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কেন? জানতে পারলাম—পরমশ্রদ্ধেয় আমাদের চিরপরিচিত অযাচিত কৃপাকারী বিশ্ববিখ্যাত ভাগবতবক্তা শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করতে করতে নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেছেন। ধীরে ধীরে ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম পরম নিশ্চিন্তে প্রসন্ন চিত্তে তিনি তাঁর বিছানার উপর শুয়ে আছেন। ভক্তরা চারিদিক ঘিরে আছে। ভক্তের লাইন পড়ে গেছে। আমিও নীরবে কাছে গিয়ে পায়ে মাথা দিয়ে বললাম, "কোথা বা লুকালে, হা পরম করুণ গৌরাঙ্গগণ তোমরা একে একে সব কোথা লুকালে, আমাদের কার কাছে রেখে গেলে?"

আসুন, আজ একবার তাঁর শ্রীচরণ স্মরণ করে বসি। একান্তভাবে তাঁর ভাবগম্ভীর পাঠ স্মরণ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি একবার তাঁর চিত্রপটের সামনে গিয়ে একটু চুপ করে পাঁচ মিনিট বসি তাহলে ঐ চিত্রপটের মধ্য থেকেই তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত পাঠ আবার আমরা শুনতে পাবো। একবার তিনি শ্রীগুরুতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন শ্রীগুরুদেব অপ্রকটে বেশী কৃপা করেন। তবে সেই কৃপা ব্যক্তিসাপেক্ষ। অপ্রকটের পর তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করলে ব্যাকুল প্রাণে তাঁর কৃপা স্মরণ করতে হবে। চোখের জল ফেলতে হবে। সেই সুখময় সঙ্গের অভাবের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুতাপ ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ এদিকের ব্যাকুলতা যত তীব্র হবে ওপারের টান তত পড়বে। অবশেষে দেখা হবেই হবে। কেননা, চিত্রপট আর স্বরূপ তো এক। গুরু গৌরলীলা ত্রিকাল সত্য। পাঠবাড়ী ছেড়ে তিনি যেতে পারবেন না। কারণ বাবাজী মহাশয় পাঠবাড়ীতে বাঁধা আছেন। তাঁকে ছেড়ে তাঁর একান্ত অনুগত সেবক কোথায় যাবেন? আজও গৌর ভাগবত-আচার্য্যের ঘরে নৃত্য করছেন। যাঁর শ্রীগুরুকৃপায় প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে সেই ভাগ্যবান তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন।

—**ডঃ শান্তিরাণী মণ্ডল**, এম. এ., পি. এইচ. ডি.

হরি কথা কথা, আর সব বৃথা—ব্যথা

—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ স্মরণ

শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস জয়তু তোমার।
শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর কথা বদনে যাঁহার ॥

কৃষ্ণানন্দ দাস দাদা কৃষ্ণকথামৃতে।
ষড়ৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যময় ভগবৎকথাতে ॥

নাস্তিক যতেক পাপী আস্তিক করিলে।
নরদেহে আবশ্যিক ভজন জানাইলে ॥

নষ্ট করিনু জনম বিষয় ভোগেতে।
দর্প আমিত্বে ভরা মলিন চিত্তেতে ॥

দান তব অকৃপণ ভাগবতী কথা।
সরস পাণ্ডিত্যে পূর্ণ নাহি শুনি কোথা ॥

বাচন ভঙ্গিমা তব মধুর অনবদ্য।
বাহিরে না যাও ছাড়ি মূল প্রতিপাদ্য ॥

জীবে শিক্ষা দিতে হয় তব আগমন।
মধু ভাগবতী কথায় অমৃত সিঞ্চন ॥

হা মোর কেদার দাদা কে শোনাবে আর।
রাধা-কৃষ্ণ নিতাই-গৌর কথামৃত সার ॥

জয় কৃষ্ণানন্দ দাস শ্রীচরণে নমি।
স্মরণে রেখো পামরে অপরাধ ক্ষমি ॥

রহি যেন শ্রীনিতাই-গৌর স্মরণে অন্তে।
নহি যেন পথভ্রষ্ট জীবনের প্রান্তে ॥

—ডাঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র সাহা

"কৃষ্ণানন্দ দাস স্মরণে বিরহ উচ্ছ্বাস"

কেদার পণ্ডিত—এই নামেতেই উনি বাবাজী মহারাজের অনুগৃহীতদের মধ্যে বিশিষ্ট এক পণ্ডিত। কেবল পণ্ডিত এই আখ্যামাত্র দিলেই ঠিক না, তিনি বিশিষ্ট সাধকাগ্রগণ্য।

চৈতন্যচরিতামৃতে দেখতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু এবং রায়রামানন্দের মধ্যে কথোপকথনের সময় মহাপ্রভু জানতে চাইলেন—"দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?" রায়রামানন্দ উত্তর করলেন— "কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি পর॥" আমাদের এখন সেই বিরহ দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে কৃষ্ণানন্দ দাসজীকে হারিয়ে। হৃদয়ে যে ব্যথা উঠছে তা দূর করতে হলে একটিমাত্র উপায় আছে তা হল তিনি আমাদের যা পরিবেশন করে গিয়েছেন তা স্মরণ করা। তাঁর স্মরণাত্মক সম্বন্ধটুকু সঙ্গে নিয়ে আমাদের পথ চলতে হবে, বোধহয় তিনি ও আমরা এক সঙ্গে ভোগ করব। তাঁর ভোগের ভাগ জোর করে ছিনিয়ে নিতে হবে।

মনে পড়ে, তিনি একবার মহাপ্রভুর লীলা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতের "ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাম্" শ্লোকটি ব্যাখ্যায় বলেছিলেন—আমিতো তোমাদের (গোপীদের) ঋণ শোধ করতে পারলাম না, "প্রতিযাতু সাধুনা"—কোন সাধু পুরুষ এসে এই ঋণ শোধ করুক। এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন মধুরিমা" বলতে বলতে কৃষ্ণানন্দ দাসজীর ভাব বিভোরতা আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল। মহাপ্রভুর লীলা অনুধ্যান করতে গেলে যে তন্ময়তা দরকার সেই তন্ময় সাধকের মুখ থেকে গৌরলীলা শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। তিনি গৌর প্রেম-রসার্ণবের দ্বার উন্মুক্ত করে গিয়েছেন। সেই পথ ধরে চলতে পারলে রসার্ণবের একবিন্দু দানে আমাদের জীবনকে ধন্য করবেন—এই আশা হৃদয়ে রেখে পণ্ডিত মশায়ের নিকট আমরা কাঙ্গালের মত প্রত্যাশী হয়ে আছি। তিনি নিত্যলীলার রস আস্বাদন করলেও আমাদের এই আর্তি যেন স্মরণে রাখেন এইটুকু প্রার্থনা।

—শ্রীহেমাঙ্গ প্রসাদ দাস

"আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা না বুঝিলে ব্রজলীলা বুঝিতে পারি না।"

—নবীনচন্দ্র সেন

শ্রীল শ্রীমদ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহোদয় স্মরণে

শ্রীগুরু কৃপাপুষ্ট লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাগবত-সাধক পরমবৈষ্ণব শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহোদয় অকস্মাৎ নিত্যলীলায় অনুপ্রবৃষ্ট হয়েছেন। তিনি বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব। আবাল্য বরাহনগর শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের পাঠবাড়ীতে তাঁর শ্রীগুরুদেব প্রখ্যাতনামা বৈষ্ণবাচার্য্য, বৈষ্ণব সমাজের গুরু ও উপদেষ্টা নিত্যানন্দ-নামময় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের সান্নিধ্যে থেকে বৈষ্ণবশাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত ও ভাগবতবক্তারূপে স্বনামধন্য হয়েছিলেন। পূর্বাশ্রমে তিনি পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ রায় নামে সুপরিচিত ছিলেন। "এক অঙ্গ সাধে কিবা সাধে বহু অঙ্গ"; এক অঙ্গ ভক্তিমার্গের সাধন দ্বারা শ্রীগুরু কৃপায় তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। ভগবৎপ্রেমের সাত্ত্বিক ভাব তাঁর অঙ্গে পরিলক্ষিত হোত। তিনি শুদ্ধ-সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য। তাঁর ভাগবতীয় কথা কীর্তনে পাষাণ-হৃদয় প্রেমে বিগলিত হোত। ভগবৎভজনে কৃষ্ণভজনে উন্মুখ হোত শত শত নর-নারী। ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই এটি সম্ভব। তাঁর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন তাঁর অগণিত আশ্রিত জন ও গুণগ্রাহী ভক্তমণ্ডলী। দেশ-বিদেশে বাবাজী মহোদয়ের নাম পরিব্যাপ্ত, তাঁর অন্তর্ধান ভাগবত ধর্মাবলম্বী সমগ্র বাঙালী সমাজের নিকট বিনা মেঘে বজ্রাঘাততুল্য। ষষ্ঠ দশক-কালাধিক তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাগবতবক্তারূপে বাংলার আকাশে ধ্রুবতারার মত অত্যুজ্জ্বল হ'য়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে আপামর ভক্ত-অভক্ত, কুমতি-কুতার্কিক এমনকি নাস্তিক জন-মানসে ভাগবত-রস, ভক্তি-রস পরিসিঞ্চিত হোত তাঁর সুমধুর প্রাঞ্জল ভাষায় ভাগবত-ভাষণ শ্রবণে, আস্বাদনে। তাঁর ভাগবত-রস পরিবেশনের সুনিপুণ ধারায় এমনই মাধুর্য্য ছিল যাতে সকলেই আকৃষ্ট হতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায় "ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"--এ বাক্য সার্থক হয়েছিল বাবাজী মহোদয়ের জীবনে। তাঁর মুখ-নিঃসৃত অমৃততুল্য ভাগবতীয় কথা হৃদয়ঙ্গমে শুদ্ধ চিত্তে উদয় হয় ভাবের তরঙ্গ। অভিধেয়-তত্ত্ব-কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি ঘটে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারি ভাব সংমিশ্রণে স্থায়ি ভাব। এটিই তাঁর হৃদয়গ্রাহী ভাগবত ভাষণের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে "ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ"। যে ব্যক্তি হরিকথা কীর্তন করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। শ্রীভগবানের নাম-গুণ-যশ কীর্তনকারিগণ ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শুক, নারদাদি ভক্ত-প্রবরদের কথা ভাগবত পুরাণে শুনেছি; প্রত্যক্ষ স্বরূপ দর্শন হয়নি, কিন্তু আমরা দেখেছি দাতা-শিরোমণি শ্রীল বাবাজী মহোদয়কে, ভাগবত কীর্তনে, ভাষণ প্রভাবে কৃষ্ণ-প্রেম বিতরণের মাধ্যমে। "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" শ্রীভগবানের লীলা-কথা শ্রবণে ভগবৎ ভজনে তৎপর (ভগবৎ পরঃ) করে দিতেন তিনি ভাগবতীয় কথা কীর্তনে।

"বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদ-সলিলং যথা—" (ভাঃ ১০/১/১৬)

বাসুদেব চরিত্র-বিষয়ক বক্তা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতা সকলে পবিত্র হন। শ্রীমদ্ বাবাজী মহোদয় পবিত্রকারী ভগবৎ-কৃপা-শক্তির আধার। তাঁর ভাষণের সঙ্কলন গ্রন্থাকারে সমাদৃত। বিভিন্ন স্থানে বিবিধ ভাষণ গ্রন্থে সঙ্কলিত, প্রকাশিত হয়েছে বিদগ্ধজন দ্বারা।

তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। তাঁর মুখের সুমধুর ভাষণ আর আমরা শুনতে পাব না। পরম বৈষ্ণব তিনি, তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য থেকে বাংলা তথা বাঙালী জাতি বঞ্চিত হোল।

তাঁর অন্তর্ধানে যে অপূরণীয় ক্ষতি হল তা কোনদিনই পূরণ হবে না। এ ক্ষতি ভোলার নয়।

বৈষ্ণব জন্ম-মৃত্যু বন্ধনহীন। বৈষ্ণবের মন-প্রাণ দেহান্দ্রিয়াদি, তাঁদের জীবন মর্ত্যবুদ্ধি-বিচারের বিধি-নিষেধের উর্ধে। বৈষ্ণবের তিরোভাবে শোক প্রকাশ করা, চোখের জল ফেলা যদিও নিষেধ, তথাপি কৃষ্ণভক্তের বিরহ-বেদনার মত আর দুঃখ নাই। আমরা মায়াবদ্ধ বহির্মুখ; কৃষ্ণ-ভক্তিহীন, তাই বুঝতে পারি না। শোকে কাতর হই, মর্মাহত হই।

মহাজনদের কথায় বলতে হয়—"কিন্তু তবু শোক করব না, চোখের জল ফেলব না। বাবাজী মহোদয়ের নিত্য জীবনের আজ অনুধ্যান করব।"

কলিকাতা যাদবপুর অঞ্চলে লায়েলকাস্থ মুক্তাঙ্গনে "নব-বৃন্দাবন"-এ প্রভাতী প্রার্থনা-কীর্তন বাসরে বাবাজী মহোদয়ের তিরোভাব স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রার্থনা, তিনি যেন নিত্যধাম থেকে আমাদের আশীর্বাদ করেন। আমরা যেন তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত না হই। তাঁর চরণপ্রান্তে এই প্রার্থনা নিবেদন করতঃ আমাদের অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করছি।

শ্রীসুধীর চন্দ্র দাশ
শ্রীসুরেন্দ্র মোহন দাশ
শ্রীপঞ্চানন সাহা

নব-বৃন্দাবন (মুক্তাঙ্গন) লায়েলকা-
নিবাসীদের পক্ষ থেকে।

"আমার দাদা"

অদ্য আমরা একটি রত্ন বা আশ্রয়স্থান, ভালোবাসা, প্রীতি ও স্নেহপ্রাপ্তির স্থান হারালাম। এমন আদর করে ডেকে কাছে বসিয়ে "শ্রীগুরু গোবিন্দকথা বলার আর কেহ নাই।" কোন দুঃখ বড় বিপদ এলে অথবা মনে কোন জটিল প্রশ্নের উদয় হলে, তার সহজ সমাধান সরলভাবে করে দিতেন তিনি। এত সহজভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতের তত্ত্বাংশ, লীলাংশ ও ভাবাংশকে আর আমাদের বোঝাবে কে?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা, ঠাকুর হরিদাস নির্যাণ প্রসঙ্গে নিজমুখে বলেছেন—

হরিদাস ছেড়ে গেল প্রাণে বাঁচা ভার।
দিনরাত নাম শোনাও তিন লক্ষ বার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিহারভূমি শ্রীল ভাগবত আচার্য্যের এই বসতিভূমি। এখানে প্রভু এসে পাঠ শুনে তিন প্রহর নৃত্য করে মূর্ছিত হন এবং পরে আলিঙ্গন দিয়ে পাঠক শ্রীরঘুনাথ উপাধ্যায়কে ভাগবতাচার্য উপাধি দেন, অন্য কোন কার্য্য করতে নিষেধ করেন।

আমাদের শ্রীগুরুদেবের পূর্ণ সমাধিও এই পাঠবাড়ীতে বিদ্যমান। তাঁকে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ শোনাবার জন্যই যেন কেদারদাদার আগমন। দীর্ঘদিন শ্রীগুরু সেবার মাধ্যমে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবত রস আস্বাদন করিয়ে তিনিও আজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন।

এঁর জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামে। পিতা শ্রীরামবংশ রায় মহাশয়, মাতা শ্রীযুক্তা বিপত্তারিণী দেবী। জন্ম ১৩২০ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, কৃষ্ণাদশমী। পূর্বে দুই কন্যা নষ্ট হওয়ার পর বাবা আশুতোষের সন্তোষে এনার জন্ম। নাম তাই কেদারনাথ। দেখতে খুব সুন্দর। পাছে নজর লাগে তাই ডাক নাম 'কালো'।

শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমস্থ শ্রীশ্রীভাগবত চতুষ্পাঠীর প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রীজী। বালক কেদারনাথের শ্রুতিধরত্ব এবং বিচক্ষণতায় আকৃষ্ট হয়ে অধ্যয়নের জন্য উপনয়নের পরই মামার নিকট চেয়ে নেন।

এ সময় তিনি পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে বাঘেরহাট (পূর্ব বাংলায়) যান। এবং পণ্ডিত মহাশয়ের নির্দেশে কিছুদিন সেখানে অধ্যাপনাও করেন।

ইতিমধ্যে ১৩৩৪ সালে শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের সেবাভার শ্রীপাদ গ্রহণ করেন। দর্মাহাটা মঠের টোল বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। পণ্ডিত মহাশয় কেদারনাথ, চণ্ডীচরণ,

বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি ছাত্রগণ নিয়ে এখানে আসেন এবং সেবা পরিচালনায় সহযোগিতা সহায়তা করেন। টোলের নাম হয় শ্রীশ্রীভাগবত চতুষ্পাঠী।

আজ প্রশ্ন জাগে ইনি কে? জগতে কি দিলেন? যখন আমাদের দাদু মহারাজ শ্রীশ্রীরাধারমণ দাস দেবশক্তিবিশেষ দ্বারা এক এক জনের দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম জগতে প্রচার করেন।

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন
তিন দ্বারে সাধে কার্য্য শ্রীরাধারমণ ।।

জীবসেবায় শ্রীনিত্যানন্দ দাস (পুলিন কাকা), শ্রীনাম প্রচার শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ দ্বারা, শ্রীবৈষ্ণব সেবায় শ্রীযুক্তা ললিতা সখী মা, তেমনি শ্রীকেদার দাদার দ্বারা শ্রীভাগবতের সারাংশ, গোস্বামী গ্রন্থের সহজ সরল ব্যাখ্যা প্রচার করলেন। তাঁর ভাগবত পরিবেশনে আকৃষ্ট হয়ে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আজ সেই সকল আশ্রিতকে শোকসাগরে ভাসিয়ে হঠাৎ অপ্রকট হওয়ার কারণ কি? যাবার সময় হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের ডাক এসেছে তাই। তিনি নিত্যপরিকর, নিত্যলীলা, নিত্যবস্তু প্রাপ্তির উপায় জীবকে জাগাবার জন্য অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে পাবার উপায় শ্রীভাগবত মাধ্যমে জানাতে এসেছিলেন। শ্রীপাদ যেমন নাম নিয়ে জীব উদ্ধার করলেন, তাঁর যোগ্য শিষ্য শ্রীকেদারদাদাও শ্রীভাগবত পাঠ করে জীব উদ্ধার করলেন, আজ তাঁর প্রচার কাজ শেষ করে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন? বড় চমৎকার চিন্তার বিষয়। সাধারণ লোক দেহ রাখলে বলা হয় 'মারা গেল', শ্রীভাগবতস্বরূপ অন্তর্ধান করলে বলা হয় 'লীলা সম্বরণ' করলেন। কিন্তু গুরু বৈষ্ণব চলে গেলে বলা হয় "প্রাপ্তি" হলেন। এর মানে কি 'অন্তর্ধান'? লীলা সম্বরণের অর্থ তাঁর প্রকট লীলা গোপন করে নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। এখন আমাদের কর্তব্য কি? নিজ সুখের জন্য তাঁকে প্রভুর সঙ্গ ছাড়ানো কি ঠিক? কিন্তু আমরা যারা নিরাশ্রয় হলাম আমাদের কর্তব্য কি? শ্রীপাদ বলেছেন যে, যাঁর তিথি তাঁকে স্মরণ করে কাঁদলে তাঁর কৃপা পাওয়া যায়।

শ্রীপাদ সারাজীবন সন্ত বিরহীর মত ব্যাকুল হয়ে কেঁদে গেলেন, তাই মনে হয় একমাত্র কান্নাই সাধ্য পাবার উপায়।

আজ আমরা ভাই ভাই সবাই মিলে হা গুরুদেব বলে কাঁদি। মূল গুরুতত্ত্ব এক ভিন্ন প্রকাশ পেয়েছেন মাত্র।

কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে যে কৃষ্ণনাথ মেলে
ধনকুল পাণ্ডিত্যে কোন ফল নাহি ধরে।

এই পাঠবাড়ী তাঁর প্রাণ হতেও অধিক। তাঁর শিক্ষা গুরুবর্গ দীক্ষাগুরু সকলেই এই শ্রীপাঠবাড়ী

আশ্রমের নিত্যসেবায় মেতে আছেন। তাঁদের সাহচর্য ছেড়ে আমাদের দাদা কি অন্যত্র যেতে পারেন! যেন গুরু গৌর বিহারভূমিতে গিয়ে ব্যাকুল প্রাণে কাঁদতে পারি। এ জীবনেতে শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা কিছুই হল না। যেন শেষ দিনটিতে শ্রীগুরুরাম বলে মরতে পারি। জয় নিতাই।

—হৃদয়ানন্দ দাস
শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী, বরাহনগর

জিহ্বা যতক্ষণ নড়ে

নাম সংকীর্তনের মহিমা সর্বযুগে সর্বশাস্ত্রে বন্দিত এবং নাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ উপাসনারূপে স্বীকৃত। অজামিলের মুক্তিলাভ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত এই নামকীর্তনেরই স্বীকৃতি। অপর সাধনাঙ্গ এর কাছে ম্লান—"দেহ দেহী, নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।"

আমাদের শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দজী ছিলেন এই নামকীর্তনের এক মহাপ্রতীক ও মহাপথিক। নামগান, কৃষ্ণকথা বিনা তাঁর মুখে আর আন কথা কিছু ছিল না।

বাচিক, উপাংশু ও মানস ভেদে জপ তিন প্রকার। জপ উচ্চকণ্ঠে হলে বাচিক, ওষ্ঠাধরে মাত্র উচ্চারিত ও নিজ শ্রবণার্থ হলে উপাংশু ও মানস জপ সম্পূর্ণরূপে মনে মনে করণীয়। আমাদের অগ্রজতুল্য কৃষ্ণানন্দজী ছিলেন এই তিন জপের আদর্শস্থল। বাচিক জপেই তাঁর সর্বপরিচিতি। কিন্তু উপাংশু বা মানস জপ ব্যতিরেকে এরূপ সার্থক বাচিক রূপ তো সাধারণ জনে দৃষ্ট হ'ত না। পরমহংস তিনি তাঁর অগণিত ভক্তের দ্বিগুণিত সমস্যার সমাধান করতেন কিন্তু কখনও লিপ্ত হতেন না। বরং আপন জপমহিমায় বিভোর হয়ে থাকতেন; তিনি ছিলেন—

খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয় ॥

নামকীর্তনের যে কোন স্থান কাল পাত্রভেদ নাই একথা তিনি সর্বদাই সকল পাঠে বলতেন। বলতেন নাম ততক্ষণই করবে "জিহ্বা যতক্ষণ নড়ে"।

—কৃষ্ণচৈতন্য দাস
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আশ্রম, বাঁকুড়া

ভাগবত রসামোদী শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাসজী

"নিজ নিজ আহার তো পশু পাখীরাও জোগাড় করে থাকে, দশজনকে খাওয়াইয়া যে খায়—সেই তো প্রকৃত মানুষ।"—কথাটি জগদবন্ধু সুন্দর বলেছিলেন শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজকে উদ্দেশ্য করে। তাই জগৎ আজ রামদাস বাবাজীকে পেয়েছে 'ভুরিদা' রূপে। আর আমরা যারা পরবর্তীকালে রাধারমণগণের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছি সে তাঁরই অনন্ত প্রকাশের মাধ্যমে। শ্রীমদ্ বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী বললেন, "অনন্ত তরঙ্গে বিতরিছ রঙ্গে, প্রেম বারি বিশ্ব ভরিয়া।"

সেই অনন্ত তরঙ্গের একটি তরঙ্গ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ বাবাজী মহারাজ। শ্রীগুরু বাক্য—"রান্না করা খাওয়াই ভাল, রান্না করে খাওয়াতে ঝামেলা আছে।"—পালন করে সারাটি জীবন তিনি গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত গ্রন্থসমূহ আস্বাদন করেছেন এবং করিয়েছেন সকলকে শ্রীমৎ ভাগবত পাঠের মাধ্যমে। এইভাবে শ্রোতাদের শ্রবণাঙ্গ ভক্তিযাজন করিয়ে বন্ধু সুন্দরের "দশজনকে খাওয়াইয়া খাওয়া" কথার সার্থকতা বজায় রেখেছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতবক্তা হিসাবে বাংলা ও বাংলার বাইরে তাঁর খ্যাতি ছিল। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় নদে, নীলাচলে, বৃন্দাবনে যখন সেইকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলানুগত্যে কীর্তন আস্বাদন করতেন, পরবর্তীকালে শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ বাবাজী সেই সেই স্থানে সেই সেই লীলা প্রসঙ্গ পাঠের মাধ্যমে সরল সুন্দর ব্যাখ্যা দ্বারা সহস্র সহস্র ভক্তদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে আনন্দদান করতেন। তাঁর ভাগবত পাঠের বৈশিষ্ট্য হল তত্ত্ব কথার অন্তর্নিহিত জটিল তাৎপর্য্যগুলিকে অতি সহজে শ্রোতাদের নিকট তুলে ধরা।

বাংলা ১৩৯৭ সালের ১৫ই বৈশাখ (ইং ২৯শে এপ্রিল ১৯৯০) শুক্লাপঞ্চমী তিথি রবিবার অপরাহ্নে তিনি আমাদের ছেড়ে তাঁর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সান্নিধ্য লাভ করলেন। রাধারমণগণের একটি উজ্জ্বল বর্তিকা নির্বাপিত হল, আমরা দিশেহারা হলাম। তিনি মদীয় গুরুমহারাজের (শ্রীমৎ বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী মহারাজের) তিরোভাব স্মরণে লিখেছিলেন—"কেবল তাঁর কাছে ইহাই প্রার্থনা যে, যে সকল মানুষকে তুমি ভক্তিপথে আনিয়াছ, তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিও, তাহারা যেন পথভ্রষ্ট না হয়। তোমার রেখে যাওয়া কাজগুলি তোমার ছেলেরা যেন তোমার কাজ মনে করিয়া থাকে"। —তাঁর সেই কথা স্মরণ করে এই অধম তাঁর চরণে উক্ত প্রার্থনাই সকাতরে জানাচ্ছে।

—দীন হরিচরণ দাস (পাঠক)

আমার শ্রীগুরুদেব্

শাস্ত্র বলেন, মহাজন বলেন—

"ক্ষণত্যাগে কুতো বিদ্যা, কণত্যাগে কুতো ধনম্।"

যে ব্যক্তি ক্ষণ অর্থাৎ সময় ত্যাগ করে কিংবা বৃথা নষ্ট করে তার যেমন বিদ্যা হয় না, যে ব্যক্তি চালের একটি কণাকে ত্যাগ করে সেই ব্যক্তির তেমনি ধন হয় না।

এই কথার মূর্ত বিগ্রহ আমার শ্রীগুরুদেব। সময়কে তিনি কখনও বৃথা নষ্ট হতে দিতেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠই তাঁর জীবন। কিংবা অন্যভাবে বলা চলে—তাঁর জীবনটাই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ। পাঠের সময় ছাড়া অন্য সময়ও তিনি ভাগবতীয় কথার রস আস্বাদনেই ডুবে থাকতেন। আমরা তাঁর সঙ্গে অন্য কথা অনেক বলেছি। তিনিও আমাদের সেইসব কথাতে যোগদান করেছেন বটে, কিন্তু কখনও মাতেননি। মেতেছেন একমাত্র হরিসভাতে আর হরিভক্ত কথাতে।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" (গীতা—২।৬৯)

আমার শ্রীগুরুদেবকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন বা জানেন যে, শ্রী-ভগবানের এই গীতা-উক্ত বাক্যে মুনির যা লক্ষণ তার মূর্ত প্রতীক তিনি। বিষয়-বিষ্ঠাতে তিনি জেগে আছেন তা কেউ কখনও দেখেনি। সকলেই দেখেছেন একমাত্র তত্ত্বনিষ্ঠাতেই সর্বদা তাঁর জাগরণ।

ভাগবত পাঠের পূর্বে পঞ্চতত্ত্বের কীর্তন হয়। অনেক জায়গায় তাঁর সঙ্গে গেছি—তিনি কৃপা করে নিয়ে গেছেন। হয়তো কোথাও কীর্তনের ধ্বনি তাঁর কানে আসছে—"প্রাণ ভরে জয় দাও, আমার নিতাই গৌর সীতানাথের প্রাণ—প্রাণ ভরে জয় দাও।" তারপর তারা যোগ করল—"জয় দিলে জয় হবে। নিতাই গৌর সীতানাথের প্রাণ ভরে জয় দাও"—এই পদ শুনলেই তিনি ক্ষেপে যেতেন—বলতেন—"তোমার "জয়" দেবার কথা জয় দাও, আবার নিজের জয় চাইছ কেন বাবা? স্ব-সুখ বাসনা কেন?"

আমার শ্রীগুরুদেব বলতেন—"যেই তুমি, "জয় আমি" বলেছ ওমনি তুমি গেলে। 'জয়'-টা শুধু শ্রীগুরু পাদপদ্মেতেই থাকবে। ওখান থেকে সরিয়েছ কি মরেছ।"

আবাল্য তিনি তাঁর শ্রীগুরুপাদপদ্মনিষ্ঠায় ভরপুর নির্মল এক সাধু। "সাধু"—এই শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলতেন—কৃষ্ণতৃষ্ণার নাম সাধুত্ব। কে কেমন সাধু তা বোঝবার থার্মোমিটারটা নিজের বগলে দাও, তাহলেই বেরিয়ে পড়বে তুমি কেমন সাধু।

সর্বজনবিদিত তাঁর পাণ্ডিত্য। সকল সুধীসমাজ তাঁর পাণ্ডিত্যে, তাঁর পরিবেশনপটুতায় মুগ্ধ। কথাই তাঁর জীবন। কিন্তু তিনি কখনও মহাজনদের অননুমোদিত কথা বলতেন না। যে মহাজন যে কথা যে ভাবে আস্বাদন করেছেন, তিনি একটুও ব্যতিক্রম ঘটাতেন না সে সব কথার। মনে হতো যেন মহাজনদের বাক্যের জেরক্স কপি তাঁর শ্রীমুখমণ্ডল। মহাজনীয় বাক্য ছাড়াও অন্যান্য অনেক ব্যক্তির কথার উদ্ধৃতি দিতেন তিনি। সে হয়তো খুব সাধারণ ব্যক্তি, তাঁর কাছে অতি নগন্য, তথাপি তার কাছ থেকে শোনা কথাটা তার নাম করে ঠিক সেভাবেই বলতেন। কথাগুলি নিজের কথা বলে কখনও চালাতেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—"আমার পাদপদ্ম ভজনের ফল—অজ্ঞ বিজ্ঞ দুইয়েরই সমান। অর্থাৎ আমার পাদপদ্ম ভজনের ফলপ্রাপ্তিটা অজ্ঞ বা বিজ্ঞ দুজনেরই সমান হবে।" উদ্ধবজী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন—"গোবিন্দ, এ তোমার কেমন বিচার? বিজ্ঞ ব্যক্তি—যে তোমার মহিমা জেনে তোমার পাদপদ্ম ভজে, আর অজ্ঞ ব্যক্তি—যে তোমার মহিমা, তোমার তত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ তোমার চরণ ভজে—এই দুইয়েরই ফলপ্রাপ্তিটা সমান হবে? এর যুক্তি কী গোবিন্দ?" ভগবান তখন উত্তর করছেন 'অগ্ন্যুঞ্চবৎ'। অগ্নি যেমন অজ্ঞ, বিজ্ঞ বিচার করে না, অজ্ঞ বা বিজ্ঞ যে-কেউ আগুনে হাত দিক তার হাত যেমন পোড়ে—দুই জনকেই সমান ফল দেয় আমার শ্রীগুরুদেবও তেমনি—তাঁর কাছে অজ্ঞ, বিজ্ঞ বিচার নাই—যে আসে সকলেই আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। তাঁর কাছে বসে থাকলে তিনি যে শুধু বিজ্ঞজনকেই আনন্দ দান করেন তা নয়। আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁর কাছ থেকে অফুরন্ত আনন্দ পেয়েছে। তাঁর সদা হাসিমাখা বদনখানি, কোটি মাতৃস্নেহে ভরপুর তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলখানি আমার হৃদয়ে সর্বদা উজ্জ্বল হয়ে জাগ্রত থাকুক, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁর পাদপদ্মের গুণময়ী কথা যেন আমার স্মরণে থাকে—সকল বৈষ্ণবগণের নিকট আমার এই প্রার্থনা। সকলে আমাকে কৃপা করুন।

—পরিতোষ পাল

শ্রীচৈতন্যের আন্দোলন তথা-কথিত নিম্নবর্গের মানুষের কাছে মুক্তির বার্তা নিয়ে এল।"

—বিপিনচন্দ্র পাল

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কেদারদার শ্রীমুখে

কম করে ২৫ বৎসর আগে একদিন কেদারদার কাছে একাকী বসে আছি। তখন নিজেই কৃপা করে বললেন—"জানো বিনয়! হরিনামামৃত ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়ে ভাবছি এই ফাঁকে কোথাও একটু ঘুরে আসলে ভাল হয়। কারণ পরীক্ষার ফল বেরোতে অন্ততঃ তিন মাস সময় লাগবে। তখন আমার বয়স ২৫ বৎসরের মধ্যে। মনে ইচ্ছা হচ্ছিল পূর্ব বাংলায় গেলে হয়। সুযোগও হয়ে গেল। শ্রদ্ধেয় বড় পণ্ডিত মহাশয় (শ্রীমৎ গোবিন্দদাস শাস্ত্রী) যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট থানার অধীন যাত্রাপুর রেলষ্টেশনের কাছে লাউপালা গ্রামে বিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীমৎ বালক দাস বাবাজীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আশ্রয় পেলাম।"

আমি বললাম—"ঐ আশ্রমের কিছু উত্তরে আমার জন্মস্থান। সুতরাং আমি ঐ জায়গা খুব ভাল চিনি।" আনন্দিত হয়ে কেদারদা বললেন, "তবে তো খুব ভাল হল। তোমার ঘরের কথা তোমাকেই শোনাই। সকালে মঙ্গল আরতি দর্শন প্রণাম করি। শারীরিক কোন কাজ নাই। কিছুদিন পরে আশ্রমের প্রধান সেবক আমার কাছে এসে বললেন—কেদারভাই বিকালে শুধু বসে না থেকে সন্ধ্যারতির পূর্বে দুই ঘন্টা পাঠ করলে কেমন হয়? আমি বললাম—"ওরে বাবা, সে আমি পারবো না। আমার অভ্যাস নাই।" আশ্রম সেবক বললেন, "সে কি? তুমি বামুনের ছেলে, পণ্ডিত, লজ্জা করে ওকথা বললে চলে? দেখ কেদার, বলা যায় না জীবনে কে কি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। দেখ, জগন্নাথের কৃপায় হয়তো তুমি একদিন একজন বড় পাঠক, বড় পণ্ডিত হবে।" আমি বললাম, "আমাকে একমাস সময় দিন। একটু পড়ে শুনে নিই।" তাই ঠিক হলো।

পাঠ আরম্ভ হওয়ার দিন সাতেক আগে একবার আশ্রমসেবক আমাকে পাঠের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলাম, ব্যাসাসনে বসে শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে পাঠ করবো কি করে? যেদিন পাঠ আরম্ভ হবে সেদিন এক বিরাট ব্যাপার। বহু ভক্ত বৈষ্ণব দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার জন্য আমন্ত্রিত।"

কেদারদা দেওয়ালের দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম রাঙ্গা চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। কথা বলতে পারলেন না। হাত দিয়ে নামাচার্য শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করলেন। কিছু সময় কেটে গেল। চোখ মুছে আবার বলতে লাগলেন, "বিকাল ৪টায় প্রসাদ পেয়ে বসে আছি। নামকীর্তন আরম্ভ হলো। তারপর পঞ্চতত্ত্ব কীর্তন হলো। পাঁচটা বাজে, আশ্রম সেবক আমার ঘরে এসে অভয় দিয়ে বললেন—চল পাঠ করবে। অনেক ভক্ত বৈষ্ণব এসেছেন তোমার পাঠ শুনতে।

কেন যেন আমার ভয় ভয় করতে লাগলো। সেবক আমায় আদর করে ধরে নিয়ে জগন্নাথ

দেবের সামনে গেলেন। আমাকে বললেন, প্রণাম করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করো। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে প্রার্থনা করলাম—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করো।" সেবক আমায় ব্যাসাসনের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—"কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণবদের আশীর্বাদ চাও।" আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করা মাত্র হরি-ধ্বনি উলুধ্বনি দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। জলভরা চোখ মুছে আমি হাতজোড় করে থাকলাম। ভক্তগণ আমাকে আসন গ্রহণ করবার অনুমতি করলেন। আমি ব্যাসাসনে প্রণাম করে বসলাম। ফুলমালা, তুলসী দিয়ে গ্রন্থপূজা ও স্তবস্তুতি করলাম। সেবক এসে ভাগবতের প্রসাদী মালা ও জগন্নাথের প্রসাদী মালা আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনি ও উলুধ্বনিতে আশ্রমভবন মুখরিত করে তুললেন। আমি কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম। পুনরায় গ্রন্থে প্রণাম করতে হৃদয়টা যেন দুর্বল হয়ে গেল। চোখে জল এল। ভাবলাম, কি হবে উপায়? তখন মানস-চোখে শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ ভেসে উঠল। মনে মনে শুধু বললাম, আমার আমিত্ব বিনাশ করে তোমার করে নাও। কি জানি কি হলো, ধীরে ধীরে মাথা তুললাম। কিন্তু চোখ বুজে থাকলাম। কে যেন আমায় যন্ত্রের মতো বাজিয়ে নিল—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

(চৈ. চ. আ. ১।১)

একদিনের পাঠে আমার জড়তা কেটে গেল। বলবান প্রভুর সঞ্চারিত শক্তি অনুভব করলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনি তখন লজ্জায় বা ভয়ে চোখ বুজে পাঠ করতেন। কিন্তু এখনও কেন চোখ বুজে পাঠ করেন?' কেদারদা বললেন, "না, তা নয়। তবে কি জানো বিনয়, সেই প্রথম দিন যাঁকে হৃদয়ে নিয়ে পাঠ আরম্ভ করেছিলাম আজও তারই দিকে চেয়ে থাকি। তাই আর বাইরের দিকে তাকানো হয় না।"

আজ আর কেদারদা আমাদের চোখের সামনে প্রকট নাই। অপ্রকটে সকলের হৃদয়ে স্মরণের মন্দিরে। কেদারদা আমার কাকাগুরু। কিন্তু প্রথম দিন থেকে দাদা বলে ডেকে এসেছি, তাই রয়ে গেছে। সভাসমিতিতেও তিনি আমায় বিনয়দা বলে সম্বোধন করতেন। আর তো সেই হাসিমুখে হৃদয়মাখা ডাক শুনতে পাব না। পড়াশুনা, পরীক্ষার কথা আর তো জিজ্ঞাসা করবে না। কঠিন গম্ভীর শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের কথা আর তো শুনাবে না।

সর্বশেষে বার বার প্রণাম করি তোমায়। নিবেদন করি—রাম রাধারমণকে বুকে নিয়ে আবার আসছি। জয় নিতাই জয়গুরু।

—শ্রীবিনয় কিশোর গোস্বামী, বৈষ্ণব দর্শনতীর্থ

'শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্'

কৃষ্ণানন্দ চলে গেলেন। ভাগবত কৃষ্ণানন্দ। লাভ করলেন ভাগবতী গতি। কিন্তু ক্ষতি করে গেলেন অনেক, অনেকের। তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বন্দ্ব, ভক্ত ও ভগবানের, জীব এবং ব্রহ্ম স্বরূপের সূক্ষ্ম চৈতন্যে নিত্যলীলা--শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের একটি কক্ষে দীর্ঘদিন ধরে অসাধারণ বাগ্মিতায় ভক্তজনমণ্ডলীতে নিরলস শিশুসুলভ স্বর্গীয় প্রফুল্লতায় আস্বাদন ক'রেছেন বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শুকপাখি, তাপিত হৃদয়ের আশ্রয়, কুলদেবতা রামেশ্বরের আশ্বাস ও আশীর্বাদ-ধন্যা কৃতার্থা জননী বিপত্তারিণীর বক্ষ-কুসুম সন্ন্যাসী কৃষ্ণানন্দ।

কৃষ্ণানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম কেদারনাথ রায়। পিতা রামবংশ, মাতা বিপত্তারিণী। নামগুলি কি নিছক কাকতালীয়? সন্তানহীনা বিপত্তারিণী কুলদেবতা রামেশ্বরের মন্দিরে নিশীথের অন্ধকারে ভূতলশায়িনী হ'য়ে প্রার্থনা জানালেন—আমার কলঙ্ক মোচন কর রামেশ্বর, অন্ধ, খঞ্জ—যাই হোক একটি সন্তান দাও। দেবাদিদেবের অপার করুণায় ঘর আলো করলেন অপূর্বকান্তি পুত্র কেদারনাথ। জননীর প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নি। পুত্র অন্ধই বটে—কৃষ্ণ প্রেমে অন্ধ, খঞ্জই বটে--হরিকথার অঙ্গনে স্থাণুবৎ অবস্থিতি।

কৃষ্ণানন্দ যেন কৃষ্ণের বয়স্য। কৃষ্ণকে নিয়েই তাঁর আনন্দ। আন্ কথায় মন নেই। অমৃতগর্ভ শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবৎ-হৃদয়ের মহাসংগীতের মত অনন্ত ব্যঞ্জনার্থ-রস-স্নিগ্ধ, নিকুঞ্জ-পথ-সংকেত-সম্বলিত সুধাবর্ষী শ্লোক-ঝংকারে ভগবানের লীলা-মাধুরী, পরকীয়া প্রেমের সার্থক প্রেমিক কৃষ্ণানন্দ নিজে আস্বাদন করেই তৃপ্ত থাকেননি-- যেন গোষ্ঠের সমস্ত রাখালকেই সুচতুর সংবাদ-সংগ্রাহকের মত কখনও অপরিসীম গাম্ভীর্যে, কখনও হাস্যে লাস্যে, কখনও বা প্রজ্ঞার প্রসন্নতায় পরিবেশন করে বলেছেন—ওগো, ভাগবত পরকীয়া বৈষ্ণবের কাছে।

মায়া কাঁদায়। 'নয়ন সমুখে' দেখতে না পেলেই একটা মায়িক বেদনায় কষ্ট পাই। 'শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্' (শ্রীমদ্ভাগবত/১০স্ক/১৬/২০) প্রিয়তম কৃষ্ণ সর্পগ্রস্ত হলে গোপীগণ প্রিয়বিরহিত হওয়ায় ত্রিভুবন শূন্য দেখতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণের লীলা! তেমনি মৃত্যুরূপী সর্পও কৃষ্ণানন্দকে পরাভূত করতে পারেনি। কৃষ্ণানন্দ 'জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ' (মুণ্ডক) জ্ঞানের বিশুদ্ধতায় তাঁর অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়েছে। তাঁর কৃষ্ণপ্রাপ্তি সংশয়-রহিত।

তাই জিজ্ঞাসা—তোমার কৃষ্ণানন্দকে তুমি কোথায় নিয়ে গেলে কৃষ্ণ? জানি সেই পুলিনে তোমার কেলি সম্পদের অভাব নেই।

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্ ।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনি প্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত/১০স্ক/১৩/৫)

শ্রীভগবান বলছেন—'বয়স্যগণ। এই পুলিন অত্যন্ত রমণীয়, এখানে কেলি সম্পদের সবই আছে, এখানকার বালুকা কোমল অথচ নির্মল, আর এই সরোবরের সমস্ত কমল বিকশিত হওয়ায় সৌরভে বহু বিহগ ও ভ্রমর এসেছে, তাদের ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে তীরের তরুরাজি বিলসিত হচ্ছে।' জানি, কৃষ্ণানন্দ, সেই পুলিনে তোমার কীর্তন সুখ এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিত্য লীলায় নিত্য উচ্ছ্বসিত হচ্ছে তোমার মধুক্ষরা কণ্ঠে—ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

—রামানন্দ রায়

বিরহ উৎসব

ভালোবাসা বিরহের ফুলশয্যা পেতে রাখে পথে
মথুরার সিংহাসনে ফরিয়াদী ব্রজের নন্দিনী
ভক্ত এক গুপ্তচর ছুটে আসে ভাগবত রথে
কৃষ্ণ খুঁজে আনো তবে ছাড়া পাবে ভক্তের বন্দিনী।

নামলোভী ভগবান দিবানিশি কীর্তনে আকুল
আহা! গৌর-নিতাই ভজে নিঃসঙ্গ শ্মশানের ছাই
ঠাঁই হ'ল বৃন্দাবনে গোবিন্দের চরণের ফুল
অভিশাপ নিতে হ'লে আরও কিছু পরীক্ষিৎ চাই।

কৃষ্ণ সায়রে ডুবে কৃষ্ণানন্দ শ্রীকৃষ্ণে বিলীন
রাধা নামে বাঁধা আছে শ্যামের সুঠাম অবয়ব
প্রাকৃত ব্যথায় কাঁদি আদিগন্ত আঁধারে মলিন
নামের প্রদীপে দীপ্ত সুপ্রকাশ বিরহ-উৎসব ॥

—পরমানন্দ রায়

পরম শ্রদ্ধেয় মহাভাগবত কেদারনাথ রায়
(কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের) মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জগতে প্রতিদিনই তো জন্ম-মৃত্যুর খেলা, প্রতিনিয়ত, প্রতিমুহূর্তে—কিন্তু কজনের মৃত্যু বা মহাপ্রয়াণ আমাদের বিচলিত করে বা সত্যকারের নাড়া দেয়? আমার কেদারদা কিন্তু এইরকম একজন মহাপুরুষ ও মহাভাগবত, ঠাকুর ওঙ্কারনাথের ভাষায় প্রকৃতই প্রজ্ঞানঘন শ্রীমূর্ত্তি ভগবদ্‌বিগ্রহ।

কেদারবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় দশ বছরের কিছু কালেরও বেশী। সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সচিবরূপে যখন আমি অধিষ্ঠিত সেই সময়ে বন্ধুবর অধ্যাপক ডঃ নারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য আমাকে দুই জন মহাভাগবতের নাম বলেন, যদিও তিনি নিজেও একজন মহাভাগবত। স্বর্গত রসরঞ্জন গোস্বামী এবং অধুনা প্রয়াত কেদারনাথ রায়। আমার সৌভাগ্য এদের সকলের সংগেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই। তাই কেদারবাবু আমার কাছে অত্যল্পকালের মধ্যেই কেদারদাতে পরিণত হয়েছিলেন।

কেদারদার ভাগবত পাঠ সটীক ও সভাষ্য ও বাবাজী মহারাজের দার্ষ্টান্তিক ব্যাখ্যা তাঁর শ্রীমুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য থেকে যে বঞ্চিত সে বুঝবে না কি অপূর্ব রসের খনি ও জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন এই পণ্ডিতপ্রবর। বহু তীর্থধারী অনেকানেক পণ্ডিতজনের সংশ্রবে আমি এসেছি আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে, কিন্তু কেদারদার মত এমন শাস্ত্র গুলে খাওয়া শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপ্রবক্তা আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁর কাছে বা পদপ্রান্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও আমার কোন ক্লান্তি আসত না শাস্ত্রালোচনা শ্রবণে—তিনিও স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে মধুর শাস্ত্রীয় রসালাপে বিভোর হয়ে যেতেন। জীবনে বহু দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে, বহু পারিবারিক বিপর্যয় ও শারীরিক ব্যাধি তাঁর ছিল, কিন্তু ভাগবতচর্চায়, জগন্নাথ ও সচল জগন্নাথ নিতাইচাঁদ ও পরিকরদের আলোচনা এবং বাবাজী মহারাজ রামদাসের স্মরণমননে তিনি সব ভুলে যেতেন। এক অপার্থিব জ্যোতি ও প্রশান্তি তাঁর মুখমণ্ডলে বিরাজ করত যখন তিনি ব্যাসাসনে আসীন হতেন।

আশার কথা, ডঃ শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরী ও ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী তাঁরই ভাবে ও ভাষায় অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বাদশ ভাষণ, গোপীগীতের পূর্বকথা ইত্যাদি সংকলন করে রেখেছেন ভাবীকালের জন্য কেদারদার পরবর্তী উপদেশ হিসাবে।

কেদারদা ছিলেন শ্রীভগবানে সমর্পিতপ্রাণ ও সমর্পিততনু, তাঁর জীবনের সায়াহ্নকাল যে উপস্থিত তা তিনি জানতেন, তাই প্রয়াত বাবাজী বৈষ্ণবচরণদাসের মহাপ্রয়াণের সময় থেকেই তিনি

প্রতীক্ষা করছিলেন সেই শুভ মুহূর্তটির জন্য, নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হবার জন্য, আর তাই সহসা তিনি চলে গেলেন আমাদের সকলকে বিরহসাগরে ভাসিয়ে।

তাঁর কাছেই আমি প্রথম জানতে পারি "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"—এই মহামন্ত্রের বৈষ্ণব শাস্ত্র ও দর্শনানুযায়ী প্রকৃত ব্যাখ্যা কি।

জ্যোতিষশাস্ত্রেও এককালে তাঁর অগাধ পারদর্শিতা ছিল বলে জেনেছি। তাঁকে আমার বিনম্র প্রণতি জানাই। তিনি জীবনমুক্ত। এখন তিনি ধ্রুবতারা।

—ডঃ নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি
অধ্যক্ষ, বিধাননগর কলেজ, কলিকাতা

আমার গুরুদেব

ধ্যানে জ্ঞানে কোনদিনই ভাবিনি যে এমন একজন মানবরূপী দেবতার দেখা পাব, যাঁকে আমি আমার গুরুর আসনে বসিয়ে পূজায় রত হতে পারি। কিন্তু সেদিন আমার সেই সৌভাগ্য হল, যেদিন আমি আমার প্রণম্য গুরুদেবের সংস্পর্শে এলাম। ক'জন পারে নিজ ক্ষুদ্র সংসারের মায়া কাটিয়ে, একটি বিশাল সংসারের গুরুদায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে। যে সংসারের প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ সান্ত্বনা পেতে, তাদের তৃষিত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে, কেউ বা শুধু দর্শনের আশায় ছুটে আসত তাঁর কাছে।

সদা হাস্যময়, প্রশান্তিসমৃদ্ধ মুখমণ্ডল, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী "বাবার" সঙ্গে চেনা আমার কতটুকু! কিন্তু কখন যে প্রথম দর্শনেই আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য সাজিয়েছি নিজেই জানতে পারি নি। মনে হয়েছে তাঁর কাছে নিজের "অহং" টুকু কেবল সমর্পণ করতে পারলে সবটুকু পাওয়াই পূর্ণ হবে--মনের সকল ভার তাঁর ওপর ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

যখন তাঁর পায়ের কাছে বসেছি, তখন কোনো দেবতা নয়, তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের পরম পিতা, যে পিতা দেবতার মতো দিব্যদৃষ্টিতে আমাদের মনের সকল অনুভূতি অবলোকন করে, মনুষ্যরূপী পিতার মতো স্নেহস্পর্শ ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের অন্তরে।

তিনি অবিনশ্বর, ভেবেছিলাম তাঁর জন্য চোখের জল ফেলব না. কিন্তু তাঁর শেষ দর্শনে মনটা কেমন যেন আত্মবিস্মৃত হল, কি যেন এক সব হারানোর বেদনা ছড়িয়ে গেল, তাঁর অসংখ্য ভক্তগণের মাঝে--যারা আজ অনাথ হল—নিঃস্ব হল—চোখের জলের মালা গেঁথে তারা বিদায় জানালো তাদের প্রাণের ঠাকুরকে।

গুরুদেব, তোমার আশীর্বাদ যেন চিরদিন বর্ষিত হয়, আমাদের ধ্যানে, জ্ঞানে ও প্রতিটি কাজে।

—ডালিয়া ঘোষ

স্মৃতি-স্মারকম্

কৃপা করে কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণ ইচ্ছায় হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম বন্যায় প্লাবিত গৌড়মণ্ডলান্তর্গত সুরধুনীতটে বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী অবস্থিত। এইস্থানে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথের ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতাচার্য উপাধি প্রদান করেন। পরবর্তীকালে এই স্থানেই শ্রীবৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ করুণ রসের মাধ্যমে ভক্তিরসের অপূর্ব মাধুরী পরিবেশন করিয়াছেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের যে কয়েকজন শ্রীচরণাশ্রিত কৃপাপাত্র ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শিষ্য ছিলেন শ্রীকেদার নাথ রায়।

পণ্ডিত কেদার নাথ রায় মহোদয়ের শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি স্বয়ং অনুভব করিয়া বলিতেন। পাঠের সময় অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যাসময়ে বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মিশ্রিত করিয়া বলিতেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রাচীন উপাখ্যান উদাহরণ দ্বারা শ্রোতাদের মনে চমৎকারিতা সৃষ্টি করিতেন। তিনি কলিকাতা তথা বিভিন্ন স্থানে ভাগবতী কথা পরিবেশন করিয়াছেন ইহাই কেবল নয়, নবদ্বীপধামেও ভক্তবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়া গিয়াছেন। আনন্দ সহকারে আমাকে গ্রন্থলেখনকার্যে উৎসাহ দিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীধাম বৃন্দাবনে আগমন তিথি উৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীল বাবাজী মহারাজের গণসকল বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকেদার নাথ রায় মহোদয় কয়েকটি স্থানে পাঠ করিতেন।

শ্রীল বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী মহারাজের পরবর্তী কালে বৈষ্ণব দর্শন পরীক্ষার পরীক্ষক অধিকারও শ্রীকেদার নাথ রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নামই সর্বত্র প্রচলিত, কিন্তু বর্তমান নাম শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ।

এক ভাগবত হয় ভক্তিরসশাস্ত্র।
আর ভাগবত হয় ভক্তিরসপাত্র॥

সুতরাং যাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ কৃতার্থ হইয়াছিলেন সেই ভাগবতী কথা অথবা পণ্ডিত শ্রীল কেদার নাথ রায় মহোদয়ের ভাগবতী কথামৃত গ্রন্থ শ্রবণ দ্বারা তাঁহার গুণ স্মরণ করাই বাস্তবিক স্মৃতিস্মারকম্।

— শ্রীসুলোচন দাস শাস্ত্রী
ব্যাকরণবৈষ্ণবদর্শনতীর্থ।

স্মৃতিমন্থন

দিনের পর দিন সৈকতে খুঁড়িয়া যেমন সমুদ্রের বিস্তার ও গভীরতার কোন জ্ঞানই আহরণ করিতে পারি নাই, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদমূলে বহুদিন গিয়া তাঁহার বহু কথা ও শ্রীমদ্ ভাগবত সেবা শুনিয়াও তেমনি তাঁহার জ্ঞানভক্তির একবিন্দুও সঞ্চয় করিতে সমর্থ হই নাই। এমতাবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যাওয়া কিরূপ ধৃষ্টতা তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না, তবু লিখি। শাস্ত্রে পাওয়া যায় ভগবানের পূজার চেয়ে ভক্তের পূজা বড়. কেননা, তাঁহাকে পূজা অপেক্ষা তাঁহার ভক্তের পূজায় তিনি অধিকতর প্রীত হন। আমি ভগবানের পূজা জানি না, জানি না ভক্তের পূজাও। পরম ভাগবত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে কিছু লিখিলে যদি ভক্তের পূজা হয়, এই আশায় ও প্রার্থনায় অজ্ঞান অধমের এই বিনম্র প্রয়াস।

আজ প্রায় ২০ বৎসর আগের কথা, আমার পিতৃদেবের সঙ্গে শ্রীধাম নবদ্বীপ যাই। তখন সমাজ বাড়ীতে দাদামশাই এর উৎসব। শ্রীমদ্ ভাগবত রসময় পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ দুটি নয়ন বন্ধ করিয়া অনর্গল শ্রীমদ্ ভাগবতীয় রসধারায় নিজে অবগাহন করিতেছেন এবং শত শত শ্রোতৃমণ্ডলীকে তাহার পরিবেশন চাতুর্যে অবগাহন করাইতেছেন। আমার মনে বড় কৌতুহল হইল। পিতৃদেবের নিকট নিবেদন করিলাম—ইনি কে, এমন সুন্দর শান্ত পরিবেশ তৈরী করিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত সেবা করিতেছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, "ইনি কলিকাতা বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতবক্তা, শ্রীকেদারনাথ রায়।" আমি একটু বিচলিত হইয়া বলিলাম, "কি সুন্দর ব্যাখ্যা।" তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমদ্ ভাগবত সেবার সুনিপুণতা এবং নিরলস ভাগবত সেবা পরায়ণতার কথা।—

একবার শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীগুরুকুঞ্জে শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজকে শ্রীমদ্ ভাগবত সেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। পাঠের বিষয়—"শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতি"

বক্তা শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাসজী এবং শ্রোতাগণের মধ্যে আছেন প্রভুপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণপদ গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীমৎ নিখিলানন্দ গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীমৎ দীনেশ চন্দ্র গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীমৎ যশোদানন্দন গোস্বামী ইত্যাদি।

এই সমস্ত রসিক ভাগবত সেবকগণ শ্রোতা এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ বক্তা। এই প্রভুপাদগণ শ্রীমৎ ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এক এক সময় এক এক জন আনন্দে আত্মহারা হয়িয়া যাইতেন। প্রভুপাদ যশোদানন্দন গোস্বামী উচ্ছাস সহকারে বলিয়াছেন— আমার ইচ্ছা করে দুবাহু তুলিয়া নাচি।

শ্রীগুরুকুঞ্জের শ্রীমদ্‌ভাগবত সেবার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এমন জ্ঞানী গুণী এবং ভক্তিশাস্ত্রের সুনিপুণ জনের সভায় শ্রীমদ্‌ভাগবত সেবা করার সুযোগ অন্য কোন ভাগবতবক্তার জীবনে আসিয়াছে কিনা জানা নাই, শ্রোতারা প্রত্যেকেই মূর্তিমান শ্রীভাগবত।

এই শ্রীমদ্ ভাগবত সেবা দুই দিক হইতে বিচার্য্য, একদিকে শ্রোতাগণের শ্রবণের মানসিকতা অন্য দিকে বক্তার পরিবেশনের কলা-কৌশল। এ যেন মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনিগণ পরিবেষ্টিত সভায় সুযোগ্য রসিকাগ্রগণ্য বক্তা ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব।

এবার আমার নিজ জীবনে যাহা পাইয়াছি তাহা হইতে কিছু বলি—

তাঁহার কথা কীই বা জানি! তাঁহার শ্রীমুখেই কিছু শুনিয়াছি। মধ্যে মধ্যে কৃপা করিয়া একান্তে শ্রীপাদমূলে বসার সুযোগ দিতেন, তখন যেন আবেশে বাহির হইত এক একটা কথা মিছরীখণ্ডের মত। তিনি যে অমর্ত্য জগতের পুরুষ ছিলেন তাহা বুঝিতে কাহারো বাকি নাই, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ ভাগবত সেবা, প্রকৃতই তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের সেবক। তাহা না হইলে চোখ দুখানি বন্ধ করিয়া শত শত বুভুক্ষু প্রাণীর প্রাণের আহার যোগানো সম্ভব নয়। শত সহস্র শ্রোতা পরিবেষ্টিত আসরে শ্রীনিতাই-গৌর কৃপার বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করিয়া আনন্দ সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তুলিতেছেন অথচ নিজে স্থির। বাহ্যিক দিক হইতে এ যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

তাঁহার জীবনের অশেষ গুণাবলীর কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক কথায় বলিতে হয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাসজীর প্রাণের প্রদীপ বাংলার শত শত ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়াছে, মরমী সত্যদর্শী শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাসজীর তপস্যাপুত জীবনের শুচিশুদ্ধ আচার-আচরণ, নিয়মিত ভজনশাস্ত্র-সমুদ্রে অবগাহন ও ভক্তগণকে কৃপা করিয়া অবগাহন করানো এবং হিত প্রিয় মধুময় বচনাদি মানুষের হৃদয়ে চির উজ্জ্বল আদর্শরূপে বিরাজ করিবে।

—শ্রীহরিগোপাল গোস্বামী

গোটা কতক শ্লোক থাকলে কি গৌরের ভগবত্তার প্রমাণ হবে? প্রমাণ তাঁর আচরিত কার্য্যে। তাঁর কার্য্য আলোচনা কর, দেখবে সে ভগবান কিনা।

—শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ

আমার চোখে শ্রীকৃষ্ণানন্দজী

শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী আর ইহলোকে নেই। তাঁর নশ্বরদেহ ১৫ই বৈশাখ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে পরিত্যাগ করে তিনি অমরলোকে যাত্রা করেছেন।

শ্রীরামবংশ রায় ও শ্রীমতী বিপত্তারিণী দেবীর পুত্র কেদারনাথ ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামে। ৯ বৎসর বয়সে উপনয়নের পর কোতুলপুর টোলে সংস্কৃত শিক্ষারম্ভের পর তিনি আসেন শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমস্থ শ্রীশ্রী ভাগবত চতুষ্পাঠীতে এবং যথাসময়ে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। সম্মানের সঙ্গে কাব্য-ব্যাকরণ ও পুরাণতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সেখানেও সার্থক অধ্যাপক হিসাবে স্বীকৃতি পান।

১০৮শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে বৃন্দাবনে এসে শ্রীশ্রীরামানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির প্রয়াসী এই ভাগবতরত্নটি কিন্তু আশ্রমের আবেষ্টনীর বন্ধনে আবদ্ধ করলেন নিজেকে কর্মের যজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করে। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীভাগবত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের অন্যতম অছি বা ট্রাষ্টি এবং শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকার প্রকাশক। এছাড়াও অনেক ধর্মগ্রন্থের সম্পাদক ও টীকাভাষ্যকার এবং অন্যতম ভাগবত-বক্তা।

নিরহঙ্কারী, সদালাপী, জিতেন্দ্রিয়, ভাগবতবেত্তা এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আমি আসি প্রায় ৬/৭ বছর পূর্বে। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য আমাকে যথেষ্টভাবে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর জ্ঞান সম্ভারের অনেক কিছুই এই ক্ষুদ্র আধারে গ্রহণ করতে পারিনি। তবে দেখেছি আপামর জন-সাধারণের কাছে তিনি জ্যেঠামশাই হিসাবে সহজগ্রাহ্য। গানের যেমন সুর, কুসুমের যেমন সুরভি, তেমনি অমৃতনিস্যন্দী ছিল তাঁর জীবন সাধনা। যার কাছে যতটুকু সেইভাবেই তিনি শুনিয়েছেন তাঁর অমৃতবাণী। মঞ্জুভাষণে ও স্নিগ্ধ আলাপনে তিনি অনেক শাস্ত্রীয় আলোচনাকেই প্রাণবন্ত করে তুলতেন তাঁর সুললিত ভাষার দ্যোতনায়, যা আমাদের মর্মে স্পর্শ করতো। ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ মানুষের জন্যেও ছিল তাঁর অপার করুণা, অসীম মমত্ববোধ তাঁকে দিয়েছিল ব্যথিত ও বঞ্চিতের প্রতি অটুট স্নেহ ও কোমল সহানুভূতি। জীবনের মরুভূমিতে যারা পথ হারিয়ে মরুস্থলীর সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত, তাদের সকলেই পেয়েছে তাঁর সান্নিধ্যে এসে এই বৈষ্ণবাচার্য্যের কাছে আশ্রয় এবং অমোঘবাণী বা বরাভয়। এই কালজয়ী মানুষটি ছিলেন বিবেকানন্দের ভাষায় "তৎপ্রাণস্থান"। তাই পাঠবাড়ী আশ্রমের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও নিরাসক্ত বৈষ্ণব। তাঁর বিদেহী আত্মাকে জানাই আমার প্রণতি এবং পরমকারুণিকের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর আত্মার পূর্ণ মুক্তি।

—মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়
বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট

শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্য্য-পরমপূজনীয়-শ্রীমৎকেদারনাথ-মহোদয়ানাং মহাপ্রয়াণমুপলক্ষ্য সশ্রদ্ধ-বাক্‌প্রসূনাঞ্জলিঃ

কেদারনাথং পরমং পবিত্রং
সদৈব সত্যাশ্রিতমিদ্ধবোধম্ ।
শ্রীনামসঙ্কীর্তনযজ্ঞশীলং
নমামি তং ভাগবতপ্রধানম্ ।। ১

আস্তে হরেন্াম সদা জপন্তং
হস্তদ্বয়ে শ্রীহরিমর্চয়ন্তম্ ।
চিত্তে হরে রূপমনারতং কো
ধ্যায়ন্তমীড্যং পরিচিন্তয়ামি ।। ২

বৃহস্পতেস্তুল্যমনন্তবোধং
শ্রীবৈষ্ণবাগ্র্যং ধরণীপ্রবীণম্ ।
ভূদেববর্য্যং ভুবি লোকপূজ্যং
শান্তং সুশীলং সততং নমামি ।। ৩

ত্যক্ত্বা ধরাং যাতমনিন্দ্যমাদ্যং
গোলোকধামামরলোককাম্যম্ ।
আনন্দকন্দং মহতাং দুরাপং
কেদারনাথং তমিহ স্মরামি ।। ৪

বাগ্মী বদান্যো গুণবান্ তপস্বী
শ্রীমৎ সদানন্দপরো যশস্বী ।
স্মেরাস্যশোভাতুলনীয়কান্তি-
র্নেত্রাব্জযুগ্মাশ্রিতসৌম্য-শান্তিঃ ।। ৫

ভবান্ শরণ্যো ভগবৎপ্রিয়াণাং
কুত্রাস্তি তেষাং শরণং ভবন্নম্ ।
ভবাদৃশানাং মহতাং পদাব্জং
বিনা ভবাব্ধৌ সুখদং মহার্হম্ ।। ৬

শুকায়মানং বচনে মহার্থং
রসালয়ে ভাগবতে প্রতীতম্ ।
ধন্যং মহাত্মানমুদারবুদ্ধিং
শ্রদ্ধাযুতোঽহং সততং নমামি ।। ৭

হা ! হা !! নিতান্তং বিষতুল্যমানং
সংসারবাসং পরিহায় যাতঃ।
কেদারনাথো গুণি-পূজ্যপাদো
গোলোকধামাচ্যুতভক্তলভ্যম্ ॥ ৮

ধ্যায়ং ধ্যায়ং গুরুপদযুগং যোগিগম্যং গুণাঢ্যং
গায়ং গায়ং মধুরমধুরং কৃষ্ণনামামৃতং তৎ।
স্মারং স্মারং ভুবনশিবদং দুর্ল্লভং কৃষ্ণনাম
হিত্বা মর্ত্যং মরণবিজয়ী স্বেষ্টলোকং স যাতঃ ॥ ৯

অহহ ! শ্রীহরের্ভক্তঃ কেদারনাথ উত্তমঃ।
হিত্বা সর্বান্ গুণৈর্মূর্দ্ধান্ যাতঃ স্বেষ্টং স ভূমিতঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থস্মৃতিরত্নবিরচিতো বাক্‌প্রসূনাঞ্জলিঃ।

পরমভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের মহাপ্রয়াণে শোকাঞ্জলি—

১৫ই বৈশাখ (১৩৯৭) সন্ধ্যায় বেতারে জানতে পারলাম বরাহনগর পাঠবাড়ীর কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ আর ইহজগতে নেই। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ! সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধ ভাঙ্গা জলের মতো অগণিত ভক্তশিষ্য ছুটলো গুরুদেবের শেষ দর্শনের আশায়। শারীরিক অক্ষমতা হেতু আমার সে সাধ পূর্ণ হলো না।

হে সাধকোত্তম বৈষ্ণব ! তোমার ভাগবতসমুদ্র-মন্থন করা সুধারসে আমরা আর অবগাহন করতে পারব না। কে শোনাবে তোমার আবেগভরা কণ্ঠে সুললিত ভাষায় নিতাই-গৌরের লীলা গুণগাথা ! সত্যই তুমি গুরুকৃপাধন্য।

'যার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম তার ক্রোড়ে ব্রজধাম।' সেই অপ্রাকৃত কৃষ্ণ নাম তুমি আস্বাদন করছ অহর্নিশ। সত্যই তুমি মহান। তুমি জ্ঞানতাপস। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের করুণাধারায় পরিপ্লাবিত হয়েছে তোমার ভক্তজীবন। তুমি যে লীলারসে মেতে থাক না কেন আমাদের আশীর্বাদ করে বলো—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।

—শ্রীযোগজীবন গোস্বামী শাস্ত্রী
কাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থাদি পরিবেশনে সুপণ্ডিত কৃপাময়
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ দাসজী স্মরণে

হে কেদার তুমি দেদার বিলালে ভক্তিরস সুধাসার।
জানালে জগতে শ্রীভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থে কত সুধা চমৎকার॥
তব সুধামুখে ভক্তিগ্রন্থ ভাগবতাদি পাঠ শুনে।
মহাআনন্দসুখে ভেসে যেত কত শত শত জনে॥
সংসার ও বিষয়ে লিপ্ত তারাও বারেক শুনে।
অজানা কি এক আনন্দ পরশ পেত যে তাদের মনে॥
তব কণ্ঠ হ'তে ভক্তি প্রেম রসসুধা পরিবেশন।
পরম করুণ ঠাকুরও যেন করিত আস্বাদন॥
পুরী গৌড়দেশ নবদ্বীপ আর শ্রীবৃন্দাবনাদি ধাম।
মনে হ'ত যেন প্রলুব্ধ হইত শুনিতে তা অবিরাম॥
পরম করুণ তব গুরুদেব গোস্বামিগণ সনে।
ভকতি প্রেম রসসুধা যেন উথলি তুলিত মনে॥
বিশিষ্ট দিনে গোপীগীত আদি রসসুধা পরিবেশন।
শুনা তো যাবে না তাই বঞ্চিত পরিতপ্ত সব মন॥
কৃষ্ণনামে যত সুধারস প্রেমানন্দ ধারা বয়।
জানাতে জগতে অতি সযতনে দিতে তার পরিচয়॥
শেষ জীবনে বৈষ্ণব সন্ন্যাস তাই তোমা অঙ্গী করি।
কৃষ্ণানন্দ নামেতে ভূষিত করিলেন কৃপা করি॥
সৌভাগ্য মোদের হয়েছিল পেতে ক্ষণিক ও সঙ্গলাভ।
দেখিতে নয়নে সৌম্য আননে ভরা কৃপা অনুরাগ॥
বরাহনগর মহাপীঠস্থান গরবের অধিকারী।
(যেথা) মহাবিষ্টমনে তিনটি প্রহর নাচিলেন গৌরহরি॥
সারাটি জীবন কাটালে যেথায় মধুময় লীলা স্মরি।
কিছুদিন আগে প্রভু যেথা মোদের লইলেন কৃপা করি॥
দেখালেন তব সৌম্য আনন শুনালেন দুটি কথা।
মহানন্দরস পরশেতে যেন ঘুচিল মনের ব্যথা॥

হেথা এবে ভাবি আর এ জীবনে তব দেখা নাহি পাব।
কেমন করিয়া বিরহাদি নিয়ে এ জীবন কাটাইব॥
আশ্রমবাসী ভক্তগণ এবে তোমা হারা আজ হয়ে।
জানিনা কেমনে কাটাইছে দিন বিরহ বেদনা সয়ে॥
এই দীনাধম কৃষ্ণচৈতন্যচরণে প্রার্থনা করে
তব মধুময় লীলাদি যেন রাখে তার মন ভরে॥

—জনৈক ভক্ত

কেদারদাঃ স্মৃতি ও সুর

গান তখনই সার্থক যখন গায়ক তাঁর গানের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তখন শ্রোতার সামনে তাঁর শারীর মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায়। সুরই একচ্ছত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট হয়ে ওঠে। পাঠ বা আবৃত্তিও সার্থকতার জন্যে একই শর্ত দাবী করে। কথক বা আবৃত্তিকার যখন নিজেকে গৌণ, প্রায় অনুপস্থিত করে বিষয়টিকে মুখ্য করে তোলেন, তখনই তাঁর প্রয়াস সার্থক, রসোত্তীর্ণ। কেদারদার এই আত্মলুপ্তির শিক্ষা ছিল বলেই তাঁর ভাগবত পাঠ এত আনন্দদায়ক ছিল। শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানগরিমার অহংকার তাঁর চিত্তকে সংকীর্ণ করেনি। এই আত্মবিমুখতার মূলে ছিল ভাগবত সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় উপলব্ধি। কিছু শ্লোক ও কাহিনী মুখস্থ করে পাণ্ডিত্যের ভান করা সম্ভব কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান কখনই সত্যের মর্মে পৌঁছতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন রসের সন্ধান এবং রসেই অবিরাম অবগাহন। তখন জ্ঞান এমন এক স্নিগ্ধ দ্যুতি লাভ করে যার স্পর্শে এক মনোরম শক্তির আস্বাদন হয়। শ্রীচৈতন্যদেব মহাজ্ঞানী ছিলেন কিন্তু সে পরিচয়ে তিনি সম্পূর্ণ নন, মহনীয় নন। তাঁর পূর্ণ উদাত্ত বিকাশ কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদনে।

কেদারদা জ্ঞানরসে অভিষিক্ত করেছিলেন বলে তাঁর কথায়, আচরণে কথকতায় একটা গভীর অন্তরঙ্গতার সুর ছিল। যখনই তাঁর ঘরে গিয়ে বসেছি, তাঁর ক্ষণিক সান্নিধ্যে এসেছি, তখনই মনের মধ্যে এক অচঞ্চল শান্তি অনুভব করেছি। আমরা সংসারী জীব। নানা সংস্কার আর কু-অভ্যাসের আপাতরম্য প্রাসাদ বানিয়ে বাস করি। এই প্রাসাদে বাস যে সুখের নয়, অতিমাত্র জ্বালাময় তা তীব্রভাবে অনুভব করেছি কেদারদার মতো মানুষের সংস্পর্শে এসে। আজ তিনি চলে গেছেন মহামরণের যবনিকার আড়ালে। তবু আমাদের কাছে তিনি চিরজীবী। কেবল স্মৃতি হয়ে নয়, সুর হয়ে। ভাগবতের সুর।

—প্রদ্যোত কুমার ভদ্র

ভাগবতীকথাকোৰিদ কৃষ্ণানন্দ

শ্রীভগবানের প্রিয় লীলাভূমি ভারতবর্ষ। বিষ্ণুপুরাণে বলছেন—"দেবতারা গান গাইছেন ভারতের মহিমা নিয়ে। কারণ দেবলোক হতেও বরেণ্য ভূলোক ভারতভূমি। স্বর্গ ও মোক্ষের হেতু এই দেশ, তাই দেবগণও এইখানে মানুষ হয়ে জন্মাতে চান"—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥" (বিষ্ণুপু ২/৩/২৪)

"এই পবিত্র ভূমিতে যাঁরা নরতনু ধরে আসেন তাঁরা শ্রীহরির অবতারযুক্ত মঙ্গলময় কর্ম-সমূহই সর্বদা কীর্তন করেন। তাই এই ভূমি সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত ভূতলে সর্বাধিক পুণ্যনিলয়।"—বলছেন ভক্তিপাত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত।—

"অহো ভুবঃ সপ্তসমুদ্রবত্যা
দ্বীপেষু বর্ষেষ্বধিপুণ্যমেতৎ।
গায়ন্তি যত্রত্যজনা মুরারেঃ
কর্মাণি ভদ্রাণ্যবতারবন্তি॥" (ভাঃ ৫/৬/১৩)

এমনি একজন হরিকথা কীর্তনপরায়ণ মহাপুরুষ ছিলেন শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণে বিধিসম্মত ভাবে নিষ্ণাত এই মহাপণ্ডিত বুঝেছিলেন "পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, দেশবিদেশে খ্যাতি, সদাচার সবই ব্যর্থ হবে, যদি না সাধুর চরণে শরণ নিতে পারি"—

"ষড়ঙ্গাদি বেদো, মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
অগাধপাণ্ডিত্য-কবিত্বযুক্তঃ।
সতাং পাদপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্।
বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু সদা চাগ্রগণ্যঃ।
সতাং পাদপদ্মে মনশ্চেন্নলগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥" (শঙ্করাচার্য্য)

তাই, গুরুকরণ করে অধ্যাত্মসাধনায় তিনি হলেন প্রাগ্রসর। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির প্রমূর্ত বিগ্রহরূপে লোককল্যাণে গীতোক্ত "লোকসংগ্রহ" কৃত্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অতন্দ্র

শাস্ত্র সাধনার সঙ্গে শ্রীগুরুনির্দিষ্ট পন্থায় শ্রীকৃষ্ণচরণে অকুণ্ঠশরণাগতি তাঁকে করে মহিমান্বিত। শাস্ত্র চর্চার সঙ্গে লব্ধ জ্ঞানকে নিত্যজীবনে চর্চার মাধ্যমে রূপায়িত করা ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদধূলিপূত বরাহনগরের "পাঠবাড়ীর" তিনি ছিলেন অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্রীয় পুরুষ। ইহজীবনের কর্মসমাপনান্তে প্রারব্ধক্ষয়ের পর তিনি আজ বৈকুণ্ঠের আনন্দলোকে বিরাজ করছেন। ভূলোক হতে আজ গোলোকে তাঁর অবিনশ্বর আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা বাক্য-পুষ্পোপচার নিবেদন করি—

কৃষ্ণানন্দং মহাত্মানং কৃষ্ণকথা-প্রচারকম্।
নমামঃ সততং ভক্ত্যা শ্রীহরেশ্চরণাশ্রিতম্॥

—ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী
সভাপতি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

চিরস্মরণীয়

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ বলেছিলেন আমি কারোর গুরু নই শ্রীশ্রীরাধারমণদেব সবার গুরু। আমি তখন ছোট। একদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মে বসেছিলাম। কৃষ্ণানন্দ বাবা এসে প্রণাম করলেন। শ্রীগুরুদেব (শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ) বললেন—"এখানে পাঠবাড়ীতে কেন পাঠ কর না?" কৃষ্ণানন্দ বাবা বললেন—"শ্রোতা হয় না।" শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ বললেন—"রবিবার করে পাঠ কর আমি শুনব।" সেইদিন হতে পাঠ শুরু হল এবং ভারতের নানা তীর্থে এই অধমকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন ও শিক্ষা দিতেন।

আমি লেখাপড়া জানি না, স্মৃতিশক্তিও ছিল না। শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোক আমার কণ্ঠে বসিয়ে দিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে একমাস নিয়ম সেবাতে শ্রীচরণে রেখেছিলেন ও শ্রীভাগবতী কথা শুনিয়ে ও উপদেশ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

(চৈ. চ. অ ১/১)

সকলে আশীর্বাদ করুন যেন তাঁর করুণা মনে রাখতে পারি।

—শ্রীবিষ্ণু দাস

নিবিড় সান্নিধ্যে স্মরণীয় স্মৃতি

স্মৃতি স্মরণীয়। সে স্মৃতি যদি প্রিয়জনের হয়, আপনজনের হয়, তাহা হইলে উহা অন্তরের কোন গভীর স্থান হইতে তরঙ্গায়িত হইয়া আঘাত করিতে থাকে বারংবার, বিষাদের আবর্তনে হৃদয় আলোড়িত হয়।

মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার ত্রিতাপ জুড়ান চরণছায়ায় আকর্ষণ করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন আমি যখন কিশোর বয়সে পা রাখিয়াছি। শত পিতা-মাতার স্নেহ দিয়া ভুলাইয়াছেন সব কিছুর আকর্ষণ।

সেই সময় কলিকাতায় ৯০নং দরমাহাটা স্ট্রীটের মঠে প্রথম দেখিয়াছিলাম কেদারদাকে। সহজেই তিনি বাঁধিয়াছিলেন ভালবাসার বন্ধনে। তাঁহার সেই বন্ধন অটুট ছিল শেষ দিন পর্যন্ত। যে কোন সমস্যাতে তাঁহার সহজ সুন্দর সুচিন্তিত সমাধান সহায়ক হইত আমার, মুগ্ধ হইতাম আমি। আবাল্য শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে সুখে দুঃখে একসঙ্গে থাকিয়াছি। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নাই; আর কোন কাজে তাঁহার সহায়তা পাইব না। সুদীর্ঘ দিনের সমব্যথী সতীর্থকে হারাইয়া ব্যথা যে কতখানি তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।

এইতো রথযাত্রা আগত প্রায়। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ ত্রিকাল সত্যলীলায় গৌড়ের ভক্তবৃন্দ লইয়া গৌর পরিকরদের আনুগত্যে নীলাচলে যাইবেন। তথায় ঝালি সমর্পণ, গুণ্ডিচা মার্জনাদি লীলা প্রকট হইবে। কেদারদা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাগবতীকথা আলোচনা করিবেন। কিন্তু আমরা সেই সুখ হইতে বঞ্চিত হইব। আমরা আর তাঁহার সেই শ্রুতিমধুর গৌরকথা শুনিতে পাইব না। শুধু নীলাচলে কেন, শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাসপূর্ণিমায় গৌরের লীলাকথা আর এই পাঠবাড়ীতে ভাগবতাচার্য্যের গৃহে গৌর আগমনীতে কে শুনাইবে ভাগবতের সারসুধা গোপীগীত। আর নবদ্বীপে বড় বাবাজী মহারাজের তিরোধান তিথি উপলক্ষে কে শুনাইবে ভক্ত মহিমা? যোগমায়ার পূজার সময় তাঁহার সেই শ্রবণ মন-হরণকারী স্পষ্ট উচ্চারিত চণ্ডীপাঠ আর তো শুনিতে পাইব না।

তাঁহার অভাবে আশ্রমের যে ক্ষতি হইল, বৈষ্ণব জগতের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। কিছু তো করিবার নাই, সবই শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের ইচ্ছাধীন। তাঁহার নিজজনদের তিনি যখন যেখানে যেমন রাখিবেন তেমন থাকিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক।

যাঁহারা বাবাজী মহারাজের সঙ্গ প্রসঙ্গে অভাব পুরণ করিতেন সেই শ্রদ্ধেয় রজনীদা, জীবনদা, গোপালদা, মুরলীদা, ব্রজগোপালদা, বৈষ্ণবচরণদা সকলেইতো একে একে চলিয়া গিয়াছেন, ছিলেন কেদারদা, তিনিও সঙ্গহারা করিয়া চলিয়া গেলেন।

তবে দাদার নিকট এই প্রার্থনা, তিনি প্রকটে যেমন সকল কাজে সহায়তা করিয়া শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের দিয়া যাওয়া সেবা সমাধান করিতেন আজ তেমন শ্রীগুরু সান্নিধ্য হইতে সেই সেবাকার্য সাধনে শক্তি প্রদান করেন। আর তিনি শ্রীগুরুদেবের চরণ সান্নিধ্যে থাকিয়া গুরুসেবার আস্বাদ যাহা পাইতেছেন তাহার প্রসাদ এক কণা যেন আমাদের মনে ছড়াইয়া দেন।

সকলের আশীর্বাদ ও পদরজে নিজেকে ধন্য করিয়া শেষের সেই দিনটিতে শ্রীগুরুচরণ স্মরণ করিয়া যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবার আস্বাদ পাই—নিষ্কিঞ্চনের এই নিবেদন।

—শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী
অধ্যক্ষ, বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম

স্মরণই ভজন

'অধম চণ্ডাল জনের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিলেন যাচিয়া॥'

শ্রীগুরুস্বরূপ নিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু যুগে যুগে অধম চণ্ডাল জনের উদ্ধার নিমিত্ত এজগতে আবির্ভূত হন। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম এসেছিলেন আমার মত অধম জীব উদ্ধারের জন্য। তাঁর শ্রীমুখে ভাগবত কথা এমন সহজ ও সরল ভাষায় শুনিয়েছেন যে আমার মত অজ্ঞ জনেরও মর্মে প্রবেশ করেছে।

ভারতবর্ষে এমন অদ্বিতীয় ভাগবত পাঠক আমার চর্মচক্ষে গোচর হয়নি। মানবপ্রেমের পরাকাষ্ঠা শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ আধ্যাত্মিক জগতের একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন।

তাঁর মহাপ্রয়াণে আজ বৈষ্ণবজগৎ তথা ভারতীয় মাত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজকে হারিয়ে যাঁরা এই কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করেছিলেন তাঁরা আজ সর্বহারা।

শ্রীগুরুদেবের গুণবর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই, তবুও স্মরণিকায় তাঁর কথা একটু বলে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

—শ্রীগণেশ বসাক

আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় পণ্ডিতমশায়ের পরমপদকমলে প্রণতি জানাই

"সব ধরতি কাগজ করু"
লেখনি সব বনরায়।
সাত্ সিন্ধুকি মসী করু"
গুরুগুণ লিখা ন যায়॥"

আমাদের পূজনীয় এবং শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতমশাই-এর সম্বন্ধে লিখতে বসে উপরোক্ত দোঁহাটির কথাই বার বার স্মরণ হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে এই দোঁহাটির প্রতিটি অর্থই যেন তাঁর ক্ষেত্রে যথাযথ-ভাবে প্রযোজ্য। সসীম কয়েকটি পংক্তির মধ্যে তাঁর অসীম পাণ্ডিত্যপূর্ণ মাধুর্য্যময় জীবনালেখ্য প্রকাশ করা বড়ই অসম্ভব।

আমার জীবনে পণ্ডিতমশাই-এর সান্নিধ্য এবং সাহচর্য্য লাভের সুযোগ ঘটে আমার আশৈশব শিক্ষাদাত্রী পরম শ্রদ্ধেয়া বেলাদির জন্য। তাঁর উৎসাহেই পণ্ডিতমশাই-এর কাছে বসে বেশ কিছুদিন শ্রীমদ্ভাগবত পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু অনুধাবন করেছি তাতে বলা যায় যে তিনি হচ্ছেন একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। শ্রীশ্রীমায়ের কথায় বলতে হয়— "একে হাতীর দাঁত, তায় সোনা বাঁধান"। তিনি যে ভক্তিমার্গের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহিত ছিলেন তা বোঝা যেত তাঁর মুখখানির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। সর্বদাই তিনি কি যেন এক অসীম আনন্দ-রসে আপ্লুত থাকতেন। কোন দুঃখকষ্টের গ্লানি কোনদিন পারেনি তাঁকে স্পর্শ করতে। এমনকি শারীরিক অসুস্থতা হেতু চরম রোগ যন্ত্রণাতেও ম্লান হয়নি তাঁর শ্রীমুখের পবিত্র সুন্দর হাসিটি; তাঁর সান্নিধ্যে থাকাকালীন আমরাও সেই আস্বাদ কিছুটা অনুভব করতাম, যার জন্য সহজে উঠতে ইচ্ছে করত না তাঁর কাছ হতে।

তাঁর জ্ঞানের গভীরতা যে কত সুদূরপ্রসারী ছিল তার পরিচয় পেয়েছি তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে। পাঠের সময় কোন একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যে সেটির প্রাসঙ্গিক কত উদাহরণ তুলে ধরতেন তা বলে শেষ করা যায় না। কারণ শাস্ত্রবিদ্যার প্রতিটি বিষয় ছিল তাঁর নখদর্পণে।

প্রতিদিন প্রতিক্ষণে তাঁকে বহু মানুষের বহু প্রশ্নের উত্তরদান করতে হত বলে আমি সরাসরি যদিও তাঁকে কোন প্রশ্ন করতাম না, তথাপি তিনি নিজের থেকেই নানা প্রসঙ্গ তুলে তার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। যেমন—বাহ্যিক আচার-বিচারের প্রয়োজন আছে কিনা সেই বিষয়টি

উল্লেখ করে একদিন তিনি বললেন যে, আপাতদৃষ্টিতে ধানের উপরকার খোসাটির কোন প্রয়োজন না থাকলেও তার ভিতরের বস্তুটির অর্থাৎ 'চাল'টির অস্তিত্ব এবং বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে অবশ্যই সেটির প্রয়োজন আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের মত তিনি তাঁর অমৃত মধুর বাক্যে ছোট ছোট সুন্দর উদাহরণ দ্বারা অতি বড় বড় সমস্যার সমাধান করে দিতে পারতেন। প্রয়োজন মত রসিকতার দ্বারাও তিনি খুঁটিনাটি বহু বিষয়ের মীমাংসা করে দিতেন। একবার কোন একজন তাঁর কাছে কোন একটি সামান্য ঘটনার জন্য নালিশ করতে এলে তিনি তাকে সেই ঘটনার সমতুল্য একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করে বললেন—"শোন, একজন দশটাকা দিয়ে একটি ঘর ভাড়া করেছিল। বৃষ্টির সময় সেই ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ায় সে তার বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে অভিযোগ জানালে, বাড়িওয়ালা তার উত্তরে বলেন—বলি, মাত্র দশটাকা দিয়ে তো ঘর ভাড়া নিয়েছো, তা বৃষ্টির সময় জল পড়বে না তো কি মধু পড়বে?" সেই ব্যক্তিটির তখন কথার সুরের পরিবর্তন ঘটে এবং মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

গত বছর দুর্গাপূজার সময় কথাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীদুর্গার সংহারিণী শক্তির প্রয়োজন কেন তা অতিসুন্দরভাবে একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন আমাদের দেহরূপ ভাণ্ডে তিনটি জিনিস আছে—পিত্ত, বায়ু, কফ। পিত্তের কাজ হল ক্ষুধা সৃষ্টি করা। এর দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়। সুতরাং এর প্রয়োজন আছে। তাই এটি কম হলে ডাক্তার তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। আর বায়ু ও কফ বৃদ্ধি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই এই দুটি বৃদ্ধি পেলে ডাক্তার এদের প্রভাব কমাবার জন্য এদের নাশ অর্থাৎ সংহার করার চেষ্টা করেন। কাজেই এখানে কাজ করছে সংহারিণী শক্তি আর পিত্তের ক্ষেত্রে কাজ করছে পালনী শক্তি। সেইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও যখন রজ ও তমোগুণের অর্থাৎ অসুর ও যক্ষ রাক্ষসদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখনই তার বিনাশের জন্য এবং সত্বগুণের প্রভাব হ্রাস পায় অর্থাৎ দেবতাদের ক্ষমতা কমে যায়, তখন তাঁদের রক্ষার জন্য দেবী সংহারিণী শক্তির প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ অসুর ও যক্ষ-রাক্ষসগণকে বিনাশ করেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেকটি কাজের মর্য্যাদা দিতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একদিন বললেন, "এক একটি ভাতের দানা নিয়েই একহাঁড়ি ভাত হয়, কাজেই প্রত্যেকটি দানারই মূল্য আছে। সেইরকম বহু মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারাই একটি সুবৃহৎ কাজকে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

তাঁর শ্রীচরণে আমার শেষ প্রণাম নিবেদিত হয় গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন (১৩ই বৈশাখ শুক্রবার, ১৩৯৭ সাল)। বিশেষ বিশেষ দিনে ঠাকুরবাড়ী যাওয়া আমার একটা অভ্যাস। কেন জানি না ঐদিন হঠাৎ আমার মনে হল পাঠবাড়ী যাব। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রওনা হলাম পাঠবাড়ী অভিমুখে। ওখানে গিয়ে মন্দিরে প্রণামাদি সেরে পণ্ডিতমশাই-এর ঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম দরজা বন্ধ। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম তবে কি আজকের দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু না, ভক্তবৃন্দের মুখে শুনলাম দীক্ষা দিচ্ছেন, তাই দরজা বন্ধ, আশ্বস্ত হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুলে গেল। একে একে অনেকেই ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করে কি দেখলাম ! দেখলাম নববস্ত্র পরিহিত, শান্ত-সৌম্য, সরল-পবিত্র, সহাস্য-মণ্ডিত, আনন্দসাগরে নিমজ্জিত পণ্ডিতমশাইকে। ঘরের একপাশে থেকে পণ্ডিতমশাই-এর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে শুধু এই কথাই মনে হচ্ছিল যে তিনি যেন পার্থিব জগতের অনেক ঊর্ধ্বে কোন এক জ্যোতিরাজ্যে বিরাজ করছেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে সস্নেহ আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম। অত ভিড়ের মধ্যেও অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমিও তার যথাযথ উত্তর দিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

মাঝে মাত্র একটি দিন গত হল। রবিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ আমি আচ্ছাপীঠে অফিস ঘরে থাকাকালীন বেলাদির ফোনে জানতে পারলাম কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি সজ্ঞানে আনন্দধামে প্রস্থান করেছেন। খবরটি শুনে অত্যন্ত মর্মাহত ও স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তাঁর এই মহাপ্রয়াণে আমরা আধ্যাত্মিক জগতের যে অমূল্য সম্পদকে হারালাম তা অপূরণীয়। যাঁর সান্নিধ্যলাভে বহু মানুষ জীবনে অনুভব করেছে পরম শান্তি, আজ তাঁরই মহান অমর আত্মার পরম শান্তি কামনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলাম।

—গীতা চট্টোপাধ্যায়

"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপগ্রহণ করিয়াছিল—তাহা বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যরূপে।"

—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

তব কথামৃতম্

'হরি কথাই কথা। আর সব বৃথা—ব্যথা।' ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ সেই সারকথা বুঝেছিলেন। উন্মুখ হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ষোলো বছরের শ্যামলবরণ, দিগ্‌বসন, সুবলিতগঠন, ধূলিধূসরিত-কেশজাল ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে। শোকাচ্ছন্ন, অনুতপ্ত রাজার কাতরকণ্ঠের প্রশ্ন : 'পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্বথা।' আসন্ন মৃত্যুমুখীর কর্তব্য কি? শাস্ত্র শোনবার অধিকারী, উপযুক্ত, জিজ্ঞাসু রাজাকে সাতদিন অহোরাত্র নিরন্তর হরিকথা শোনালেন শ্রীশুকদেব। শুরু হল ভাগবত কথা। দ্বাদশস্কন্ধ ভাগবত। ভক্তির কথা। হরিপাদপদ্ম আসক্তির কথা। মরণ-পথের তীর্থযাত্রী পরীক্ষিৎ। কৃষ্ণমন্দিরের দিকে চলেছেন। পথপ্রদর্শক ষোড়শ-বর্ষীয় দিগম্বর বালক শ্রীশুকদেব।

সেই সার কথাই আত্মস্থ করেছিলেন গুরুকৃপাপুষ্ট, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, পরমভাগবত শ্রীশ্রীমদ্ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহোদয়। তাঁর অবিরল সুধাবর্ষী ভাগবত-কথার পরিবেশনে, নির্বিচারে সকল ভক্তগণকে বিতরণ করে গেছেন অহৈতুকী কৃপার প্রসাদ। নির্বিশেষে দান করে গেছেন সকল রসিক-জনকে ভাগবত-ভক্তির অপার পীযূষধারা। ভগবদ্‌গুণ কীর্তনে সদা তিনি নিজের বাক্যকে করেছিলেন নিযুক্ত। হাত দু-খানিকে সঁপেছিলেন শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদির কাজে। কান দুটিকে সংযুক্ত করেছিলেন কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের কথা শ্রবণে। শ্রীমন্দির-বিগ্রহ দর্শনে তিনি তাঁর নয়নযুগলকে করেছিলেন নিবিষ্ট। ভক্তপাদস্পর্শেই তাঁর অনুভূতি হয়েছিল পূর্ণ। ভগবৎপাদ-পদ্মে অর্পিত তুলসীচন্দনের সৌগন্ধেই তাঁর নাসিকা ছিল কর্মরত। তুলসীর দ্বারায় নিবেদিত যে ভগবৎপ্রসাদ, তারই মাধ্যমে তাঁর রসনেন্দ্রিয় করত রসগ্রহণ। শ্রীহরির ক্ষেত্রদর্শনে তাঁর চরণযুগল ছিল সদা নিযুক্ত। শ্রীগোবিন্দ এবং গোবিন্দপদস্থানীয় ভক্তগণকে প্রণামের নিমিত্ত সদা নতনিযুক্ত ছিল তাঁর মাথা। তিনি বাসনাকে নিযুক্ত করেছিলেন কৃষ্ণকর্মার্পণে। ক্রোধকে ভক্তদ্বেষিজনে। আর লোভকে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের, মননের ও নিধিধ্যাসনের মহৎ আলয়ে। আর চেয়েছিলেন উত্তমশ্লোক শ্রীগোবিন্দ তাঁর জন যে প্রহ্লাদাদি, তাঁদের আশ্রয় করে আছে যে ভক্তি - সেই ভগবদ্-রতি, সেই শুদ্ধারতি! শ্রীশুকদেবমুখনিঃসৃত মহারাজ অম্বরীষের ন্যায়ই ছিল শ্রীশ্রীমদ্ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহোদয়ের নিত্য শুদ্ধ ভজন-পদ্ধতি। যা বর্ণিত হয়েছেন শ্রীমদ্ভাগবতে—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পরশেহঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।

কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

এ জগতের সমস্ত প্রাকৃত সম্পদ নশ্বর লোষ্ট্রবৎ, তা তিনি অবহিত ছিলেন পূর্ণরূপে। এ পৃথিবীর সম্পত্তি যে নির্বাণ মানে ধ্বংস 'বিদ্বান্ বিভবনির্বাণং', তা তিনি উত্তমরূপে জানতেন। তাই তাতে তিনি কদাপি অভিযুক্ত হননি, ঈপ্সিত হননি, আসক্ত হননি। প্রাকৃত রস, বৈভব সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে অনেক আগে। লীলারসময় গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে নিবেদিতপ্রাণ হয়েছিলেন তিনি, শ্রীগোবিন্দের পরম করুণায়, অপার মহিমায় ও অশেষ কৃপায়। বিরামহীন ভক্তি-রস বিতরণ করেছেন সকল সুধীজনকে, সমগ্র ভক্তবৃন্দকে নির্বিশেষে।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।

নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ॥"

শাস্ত্র বলেছেন, যে কুলে একটি বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, একজন হরিভজনকারী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুল হয় পূত-পবিত্র। যে জননী সেই সন্তান নিজ গর্ভে ধারণ করেন, সেই গর্ভধারিণী হন বাস্তবিকরূপে কৃতার্থ। পুত্রের হরিভজনের দ্বারায় সেই মা আপনিই উদ্ধার হয়ে যান। তাঁকে পৃথকভাবে আর হরিভজন করতে হয় না। যেখানে সেই ব্যক্তি বাস করেছেন, সেই পৃথিবীও ধন্য হয়ে যান। সর্বোপরি তাঁর পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে নৃত্য করেন এই ভেবে যে আমার বংশে একটি হরিভজনশীল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। কোনও কুলে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করলে সেই সুপ্রভাব ও তার মাঙ্গলিকী মহিমা এইরকম সুচারুরূপে পরিব্যাপ্ত হন। সেই কুলের শুচিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সমস্ত পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। একটি সর্বপাপহারিত্বের অপার করুণাপ্রাপ্ত হয় সেই কুল, সেই বংশ, সেই পরিবার।

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহোদয়ের পুণ্য আবির্ভাবে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতুলপুর গ্রামের ৺শ্রীরামবংশ রায় মহাশয়ের বংশ আজ সত্যিই ধন্য। পিতা ৺রামবংশ রায় ও মাতা বিপত্তারিণী দেবীর তিনি ছিলেন চতুর্থ গর্ভের সন্তান। অতি সদাশয়, নিয়মনিষ্ঠ বিপ্র ও এক প্রকৃত বৈষ্ণবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি। তাঁর পিতার পুণ্য কর্মফল তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছিলেন। যে পিতা প্রভূত বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও নিত্য দ্বিজসেবা, গুরুসেবা, দীনসেবা ও সর্বোপরি কুলদেবতা বাবা রামেশ্বরের দৈনিক নিত্যপূজা ব্যতীত জলস্পর্শ করতেন না, তিলকাহ্নিক বিনা দিবাহারে বসতেন না, কোন প্রার্থীকে কদাচ বিমুখ করতেন না – শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী ছিলেন সেই সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবপুত্র। তাঁর পিতার এক পুণ্য কীর্তি গ্রামে আজও বর্তমান। স্বহস্তে রামবংশ রায় মহাশয় পয়ার রচনা করে, শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন দ্বারা ভিক্ষালব্ধ অর্থে একটি তুলসীমঞ্চ সহিত হরিসভা স্বীয়সাধ্যমত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আজও প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন করা হয়। আবালবৃদ্ধবনিতার জন্য সেখানে প্রতি উৎসবে হয় নরনারায়ণ সেবা।

তিন মেয়ের পর শিবের কাছে সোনার বেলপাতা মানত করেন এক সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র-লাভের আশায় মা বিপত্তারিণী দেবী। শিবের অশেষ কৃপায় চতুর্থ গর্ভে জন্ম নেন সেই বিস্ময় বালক। বাবা বিশ্বনাথের পরম কৃপায় পাওয়া এই পুত্রের নাম রাখেন মা—'কেদারনাথ'। সদা হাস্যময়, দিব্যকান্তি, বিস্তীর্ণ ললাট, শ্বেতশুভ্র বপু, উন্নতশির শিবের মতই বরতনু পেয়েছিলেন এই শিবপুত্র। লীলাপুরুষোত্তমের এ এক অদ্ভুত অপরূপ লীলা। অমরভূমের নিত্যবাসর ত্যাগ করিয়ে পাঠালেন তাঁকে এই মরভূমে, জীবের আত্যন্তিক কল্যাণসাধনে, সাধন ও সাধ্যশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-কথা পরিবেশনে ও সুধীভক্তগণের কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের অলৌকিক লীলারস নিবেদনের জন্যে।

বিদ্যার যিনি অধিষ্ঠাত্রী, জ্ঞানের যিনি মূল, তিনি সরস্বতী। তিনিই সকল স্বরের ঈশ্বর। তিনি সকল সৎ-এরও মূল; তিনি সতী। তাঁর বর তিনিই স্বয়ং। তাই অন্য সকলের ক্ষেত্রে শুধু পুত্র। কিন্তু সরস্বতীর সন্তান মাত্রই বরপুত্র। দেবী সরস্বতীর বরপুত্র, কলকাতার বরাহনগরের শ্রীপাঠবাড়ীর মন্দিরাশ্রমে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শেষ ও শেষ বিস্ময়, পণ্ডিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়—কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ—আদি তীর্থের ভূষণে উপাধিত হয়েছিলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবি, ওই উপাধি তাঁর ভূষণ, না তিনিই উপাধির বিভূষণ। পদ্মর আরেক নাম শতদল। পণ্ডিত শ্রীকেদার-নাথ ছিলেন ভারতের শ্রীবৈষ্ণব সরোবরের শ্রেষ্ঠ প্রস্ফুটিত শতদল। যে সৌগন্ধে, হরিকথা শ্রবণের বিপুল লোভে, অতি দূর থেকেও প্রতিনিয়ত, অবিরাম আসতেন গন্ধে মাতাল হরিপাদপদ্মলোভী সুধীবৃন্দ। আসতেন, এসে বিনয়াবনত প্রণিপাতের দ্বারা সেবা করে তাঁর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে, বুভুক্ষু হৃদয়ে বসে থাকতেন দুটো হরিকথা শোনার পরা-জিজ্ঞাসায়, নির্মল আনন্দে। তর্ক-বিতর্ক, সম্প্রদায়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোলায়িত একশত দল এই দেশে। তার মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রীহরি পাদপদ্মে আসক্ত এক শতদল, দুর্লভ, দুর্লভ্য পাণ্ডিত্যের অহংকারশূন্য ভক্তির অলংকার-পূর্ণ কুম্ভ।

ত্রৈলঙ্গস্বামী একালের আর শঙ্করাচার্য্য সেকালের—এ যারা বলে তারা জানেই না যে ওঁরা সবাই সেই একই উৎস থেকে উৎসারিত। যেখান থেকে উৎসারিত, সেখান থেকে অনাদিকাল ধরে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। আমরা জানিই না যে যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, চার্বাক, শুকদেব, ব্যাস—এঁরা আজও মানবদেহ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আসেন 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র বিচ্ছেদহীন সূত্রে। তাঁদের তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখে চিনতে ভুল হয় না। নরেনকে দেখে যেমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্মৃত হননি বলতে: "এত দেরী করতে হয়? আমি যে তোরই জন্যে বসে আছি।" ঠিক তেমনই চিনতে ভুল করেননি নামাচার্য্য শ্রীশ্রীপাদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজ কেদারনাথকে দেখে। ১৩৩৬ সালে দরমাহাটা স্ট্রিটে, এক ধর্মশালায় তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন কেদারনাথকে। আশীর্বাদ দিয়ে বলেছিলেন: "তুই যেমন আছিস্ তেমনই থাকবি।

নিজে র*াধবি না, রান্না করা খাওয়াবি। দেখবি, তোর ওতেই সব হবে, সব পাবি।" সেই পুণ্য-তিথি থেকেই শ্রীশ্রীপাদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত হলেন পরমবিদগ্ধ পণ্ডিত, সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতবক্তা শ্রীকেদারনাথ। বৈষ্ণবজীবনে ত*ার ঘটল এক অভূতপূর্ব, অনুপম উত্তরণ। প্রবেশ করলেন জীবনের এমন এক আশ্রমে যেখানে শ্রীহরিই সার বাকি সব অসার, শ্রীহরির কথাই যেখানে স্তব বাদবাকি সব স্থূল বাস্তব, শ্রীহরি প্রসঙ্গই যেখানে ধ্রুব আর সবই অধ্রুব। শ্রীমদ্ভাগবতের অক্ষরে-অক্ষরে যেখানে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বিধৃত যে সন্দেহ থেকে নিঃসন্দেহে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে পৌছানই জীবাত্মার স্বপ্ন, সাধনা ও সংগ্রাম।

হরি এবং হর, বৃন্দাবন এবং বারাণসী, বৈষ্ণব এবং শক্তি, বাঁশি এবং ডমরু, পীতাম্বর ও দিগম্বর সে 'এক'-এরই আরেক। আরেক হয়ে দেখা দেওয়া কেবল তার প্রমাণ কাশী গেলেও পাওয়া যাবে, বৃন্দাবন গেলেও। এবং ও জায়গার একটিতেও না গেলেও। ঘরে বসেই কেউ দেখা পেয়ে যেতে পারে তাঁর, নয়ন য*ার ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না। প্রশ্ন করছে, 'হায় রে ওকে যায় না কি জানা!' যদি জানা যায় কিম্বা জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তার উত্তর হবে—জানা যায় না। জানার ব্যাপার নয়। জানান দেন যদি তিনি, তবেই যাবে জানা। কাকে দেবেন, কেন দেবেন, কখন দেবেন তা নিয়ে কেঁদে লাভ নেই। কারণ লোকে জানে না তাই বলে, ডাকার মতো ডাকলে তবে সাড়া দেন। না, নাও সাড়া দিতে পারেন সহস্র ডাকে। আবার না ডাকলেও দেখা দিতে পারেন সহস্রবার। আমরা মনে করি আমরাই বুঝি তাঁকে ডাকছি। তিনি যে আমাদের ডাক দিয়েছেন কোন্ সকালে তা আমরা জানি না। কারণ আমরা ঘুমিয়ে আছি অনেক বেলা পর্যন্ত। ভক্তই কেবল কাঁদে না; ভগবানের চোখেও অকারণ, অবারণ জল ভক্তের জন্যে। অসীম বেদনার নামই ঈশ্বর।

বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিতে শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী সেই পরমেশ্বরের অসীম কৃপাতেই জানতে পেরেছিলেন যে অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ দর্শনে আছেন, আছেন অদর্শনেও। রূপে ও অরূপে, নীলে ও অনিলে, মলে ও পরিমলে, ডাকায়—না-ডাকায়, থাকায়—না-থাকায় মিলে আছেন তিনি। এ ত*ার ইচ্ছা, এই লীলায় মেতে থাকা। কারুর কাছে ত*ার পাবার নেই কিছু, দেবার আছে। কেউ ত*ার দেখা পায় না, তিনি দেখা দেন। যাকে দেন, তিনি কেবল ত*ারই নন; যাঁকে দেখা দেন না তিনি ত*ারও। কেবল স্তব করে যে, তার কাছেই তিনি বাস্তব—এ ধারণা যার, সে জানে না সে কাকে খুঁজছে। যে তাঁকে চাইছে না, তিনি তাকেও চাইছেন। জীবকে যিনি বুক থেকে ফেলতে পারেন না, তিনিই শিব। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ তাঁকে ডেকেছিল বলে পেয়েছিল যদি তাহলে কংস, হিরণ্যকশিপু, পুতনা, জগাই-মাধাই, গিরীশ ঘোষও ত*াকে পায় কেন? পায়। তার কারণ, শেষপর্যন্ত ওপারে না পৌঁছে সবাই নিরুপায়। তাই পায় ওঁকে। যাঁকে চেয়ে পায় না কেউ, কেউ পায় তাকে না চেয়েই। যিনি হ্লাদিনী শক্তি, তিনিই যে বিনোদিনীর অভিনয় শক্তি,

আবার তিনিই যে গীতার নিরাসক্তি—এ বোঝবার নয়। এ বুকে বাজবার। আর শ্রীগুরুর কৃপায় তাই বেজেছিল শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর বুকে। অন্তরাত্মায় উদ্গীত হয়েছিল শঙ্করাচার্য্যের সেই শাশ্বত বাণী 'বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো ....কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।'

ভগবানকে ডাকলে শোক, আকাঙ্ক্ষা কিছু থাকে না, থাকবে না। 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'। যখন জীবের 'ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি' অবস্থা হবে, তখন বুঝতে হবে তার ওপরে ভগবদনুগ্রহ হয়েছে। শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীরই মুখে উচ্চারিত হয়েছে বার বার যে শ্রীভগবান এ জগতে আবির্ভূত হয়ে লীলাপ্রকাশ করেন। এ লীলা পরম পাবনী। পাবন শব্দের অর্থ যে নিজে পবিত্র এবং অপরকে পবিত্র করে। জীবকে অবিদ্যা হতে তুলে নিয়ে শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে এই লীলাকথা। আলোর দিকে অগ্রসর হলেই অন্ধকার যেমন আপনা হতেই সরে যায় তেমনি শ্রীভগবানের লীলাকথা জানলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়ে আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি হবে। শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের এক প্রাঞ্জল, অনুপম ব্যাখ্যাতা। শ্রীভগবানের অলৌকিকী চিন্ময়ী লীলাকথার বক্তা। আজীবন মায়াস্পর্শশূন্য, আজন্ম তপস্যাপূত। আমাদের মতো পাপীতাপী, একান্ত দুর্গত কলিজীবের কাছে তিনি ভগীরথের মতো ভাগবতগঙ্গাকে বইয়ে দিয়েছেন অর্ধশতাব্দীকাল ধরে। এ জগতে নিয়ম আছে ক্ষুধা যত দীপ্ত হবে, খাদ্য তত মিষ্টি হবে। ভগবৎ-রাজ্যেও তাই—যার কৃষ্ণক্ষুধা যত বেশী পরিমাণে জেগেছে, কৃষ্ণকথা তার কাছে তত মিষ্টি। কৃষ্ণবস্তুতে যার লোভ জেগেছে তারই বুদ্ধি নিশ্চিত হয়েছে বুঝতে হবে। এইটিই দার্শনিকতার সোপান। জাতবেদা কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর কৃষ্ণকথায় ছিল সহজাত রুচি। তিনি ছিলেন কৃষ্ণকথা রুচির দূতী। এক আসক্তিশূন্য বৈরাগী। শাশ্বত চৈতন্যের অণিমা। শ্রীগোবিন্দঅংশী পুরুষ। নিরন্তর লীলাতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত শ্রীগোপীজনবল্লভের চরণকমলের দাসানুদাস।

গুরু কে? গুরু কি? গুরু কেন প্রয়োজন? সাক্ষাৎ ভগবৎ-উপদেষ্টৃত্বই গুরুত্ব। 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার। 'রু' শব্দের অর্থ নিরোধক বা বিনাশক। যিনি জ্ঞানঅঞ্জন দ্বারা অজ্ঞান আঁধার বিনাশ বা দূর করেন, তিনিই গুরু। ভগবদ্‌বিষয়ক উপদেষ্টাই গুরু। গুরু হলেন ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার। যাঁর মধ্যে ভগবানের চিৎশক্তির বিলাস হয় এবং জ্ঞান-শক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই গুরু। শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলেছেন—

> "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
> ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ"॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

আমাকে আচার্য বলে জানবে। আমিই আচার্য। আমিই গুরু। শ্রীমদ্ভাগবতে সুদামাবিপ্রকে শ্রীকৃষ্ণ তিন প্রকার গুরুর কথা বলেছেন—জন্মদাতা পিতামাতা আদ্য গুরু। তাঁরা পূজনীয় সন্দেহ

নেই। কিন্তু যিনি সাবিত্র জন্ম দিয়েছেন, গায়ত্রী মন্ত্র দিয়েছেন, তিনি পূজ্যতর। আর জ্ঞানদাতা গুরু, দীক্ষাদাতা গুরু পূজ্যতম। তিনিই আমি!

''স বৈ সৎকর্মণাং সাক্ষাদ্‌দ্বিজাতেরিহ সম্ভবঃ।
আদ্যোঽঙ্গ! যত্রাশ্রমিণাং যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ॥" (ভাঃ ১০।৮০।৩২)

আত্মজ্ঞানপ্রদাতা গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব ভগবান নিজে শ্রীমুখে বলেছেন—জ্ঞানদাতা গুরুর যে সেবা, সেইটিই ভগবদ্-আরাধনায় পর্যবসিত হবে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ্ বলেছেন—''তস্য ভগবৎসেবা-মপি নাপেক্ষতে''। যে ব্যক্তি গুরুসেবা করবেন বা করেন তাঁর ভগবৎ-সেবা করারও প্রয়োজন পড়ে না। তাহলে ভগবৎ সেবা কি হবে না? তার কি কোন প্রয়োজন নেই? তা কি বাদ যাবে? না। গুরু-সেবাতেই ভগবৎ-সেবা হবে।

''নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥'' (ভাঃ ১০।৮০।৩৪)

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—আমি গৃহস্থধর্ম, ব্রহ্মচারিধর্ম, বানপ্রস্থধর্ম অথবা যতিধর্ম দ্বারা ততখানি তুষ্ট হই না, যতখানি গুরুসেবার দ্বারা সন্তুষ্ট হই।

মানবজীবনে আমরা যা কিছু শিক্ষা করি—তাতেই গুরুর প্রয়োজন। সংসারের মধ্যে যা কিছু দর্শন করি, শ্রবণ করি, স্পর্শ করি, আস্বাদ করি - এ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করেও, যদি সেই সমস্তের তত্ত্ব জানতে হয়, তাহলে এসকল বিষয়ে যিনি অবগত আছেন সেই তত্ত্বজ্ঞ গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। যিনি বেদবেত্তা ও ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মতে শান্তিলাভ করেছেন, যিনি ব্রাহ্মণ, যিনি বাসনাহীন, সমস্ত রিপু যাঁর নষ্ট হয়েছে, যাঁর শরীর পরম নির্মল, শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে গরিষ্ঠা ভক্তি যিনি লাভ করেছেন—এমন গুরুর আশ্রয়ই প্রকৃত আশ্রয়। শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী ছিলেন গুরু হিসেবে তেমনই এক আশ্রয়। আমার মতো প্রত্যেক অকিঞ্চনকে তিনি দিয়েছিলেন দীক্ষামন্ত্র। তিনি ছিলেন করুণার অবতার। তাই জীবকে তিনি যে অন্নদান করেছেন, তা মহাপ্রসাদই দিয়েছেন। হরিভজন আত্মার খাদ্য, তাই জীবকে দিয়েছেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর মতো গুরুর আশ্রয় পেয়েছেন যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেকেই নির্বিশেষে মহাভাগ্যবান। তাঁদের মনুষ্যজন্ম সার্থক। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত সুধাবর্ষী শ্রীমদ্ভাগবতকথা পরিবেশন ছিল অপূর্ব রসামৃত। মহাপ্রসাদ। মঠে, মন্দিরে, আশ্রমে, পীঠে, ধামে, তীর্থে তীর্থে, লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে, রসিক-অরসিক, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, আশ্রিত-অনাশ্রিত, ভক্ত-অভক্ত, গৃহী-সাধু নির্বিশেষে সকল স্থানে, সকলের ঘরে-ঘরে গিয়ে তিনি পাঠ করেছেন শ্রীমদ্ভাগবত। করেছেন শ্রীহরি প্রসঙ্গের অবতারণা। আমাদের দীনদরিদ্র, মূর্খ, আতুরজীব-ভগবৎপাদপদ্ম যাতে ভজন করতে পারে, তিনি করে দিয়েছেন তাঁর সুযোগ।

তাঁর ভাষণের ভাষার মাধুর্য্যে, বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যে, বাগ্মীবাচনভঙ্গির সুভঙ্গিমায়, স্বাদু ওজস্বী কণ্ঠে, চিত্রার্পিত শ্রোতারা মুগ্ধবিগলিতচিত্তে ভাবের সমুদ্রে রসাপ্লুত হতেন।

যিনি ভগবদ্-ভজনের সাধু উপদেশে জীবকে কৃপাপূর্বক উজ্জীবিত করতে পারেন, তিনিই আচার্য। তিনিই পূজ্যতম শ্রীভগবান। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি হলেই আসবে অবজ্ঞা। অবজ্ঞা কি? "অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরুষু নরমতিঃ।" শালগ্রাম শিলাকে শিলা মনে করা, গুরুকে সাধারণ মানুষ মনে করার নামই হোল অবজ্ঞা। গুরুর ক্ষুৎ-পিপাসা-রোগাদি দেখলেও মনুষ্যবুদ্ধি না করাটাই সাধনা। মনুষ্যধর্ম গুরুতে থাকলেই বা। তুলসীতে বৃক্ষের ধর্ম আছে, কিন্তু তাকে তো আমরা সাধারণ গাছ মনে করি না। বরঞ্চ চিন্ময়ীবুদ্ধিতে প্রণাম করি। গঙ্গাজলে পাঁক, বুদ্বুদ ইত্যাদি জলের ধর্ম আছে। কিন্তু গঙ্গাকে সাধারণ জল তো আমরা ভাবি না। চিন্ময়ী বুদ্ধি সেখানেও ক্রিয়ারতা। সেইরকম, গুরু ভগবান হয়েও তাঁর মধ্যে মনুষ্যধর্ম আছে। নবযোগীন্দ্র সংবাদে বলা আছে—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।২২)

সুমঙ্গল জিজ্ঞাসু ব্যক্তির শব্দব্রহ্মে নিপুণ ও পরব্রহ্মে নিমগ্ন উপশমাবলম্বী গুরুর স্মরণ নেওয়া কর্তব্য। গুরুকেই আত্মা ও দেবতাজ্ঞান করে অকপটে তাঁর সেবা করলেই গোবিন্দ তুষ্ট হন। সচ্চিদানন্দ সুখ একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত গুরুর দুটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণই শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ, অন্যদিকে তেমনই ছিলেন ভগবদ্-ভজনে সুপারঙ্গম। কৃপাকে ফলবতী করার জন্যে ভগবদ্-ভজনানুভবের একান্ত প্রয়োজন। চরণাশ্রিত শিষ্যের শ্রদ্ধাশৈথিল্যকে নির্মূল করবার জন্যেই চাই শাস্ত্রজ্ঞানে সুপারদর্শিতা, নিপুণতা। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা সবাই যেখানে মায়ার বাঁধনে বাঁধা, সেখানে জীবকে মুক্ত করতে এসেছিলেন গুরুরূপে শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী। তিনি ছিলেন নিত্যমুক্ত, তিনি ছিলেন মায়াধীশ। তিনি এসেছিলেন গুরুরূপে জীবকে ধর্মসাধনের প্রারম্ভেই গুরুর কৃপাদৃষ্টি দিতে, যাতে জীবাত্মা মোহনিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে স্বীয় গৃহদেহকে শুদ্ধ করবার জন্যে গুরুদত্ত মহাশক্তি শরীরে প্রয়োগ করতে পারে। এর দ্বারা শরীরে এক অবিস্মরণীয় তাড়িত-শক্তি প্রবাহিত হতে থাকে। এই তাড়িত-শক্তি যতই শরীরে চালিত হয়, ততই শরীর শুদ্ধ হয়। শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী পরাশক্তিকে তাঁর চরণাশ্রিত ভক্তজনের অন্তরে জানিয়ে দিতেন, জাগিয়ে দিতেন।

কৃষ্ণ প্রসঙ্গ বিনা কাল বইতে দেননি কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী। বিধির অমোঘ বিধানে ১৫ই

বৈশাখ ১৩৯৭ অপরাহ্ন বেলা পৌনে চারটেয় নীরবে, নিঃশব্দে চলে গেলেন তিনি বৈকুণ্ঠধামের নিত্যবাসরে। মৃত্যু থেকে অমৃতে তাঁর যাত্রা হল আরম্ভ। মায়ার বাসরে বইতে আরম্ভ করেছে আরেক বাতাস। তাঁর চরণাশ্রিত সকল ভক্তজনের চোখে উদ্ভাসিত হল অন্য এক আকাশ। মানব-জীবনে সবই মন্ত্রণা। মন্ত্র কেবল ওই—যা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন, অকাতরে, পরমানন্দে বিলিয়ে গেছেন—'হরি কথাই কথা।' কৃষ্ণপাদপদ্মলোভী গোপীদের মতো আমরাও যেন না ভুলি এবং অহরহঃ বলি—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥" (ভাঃ ১০।৩১।৯)

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর শ্রীমদ্ভাগবতবদ্ধ কথাই হল শ্রেষ্ঠ হরি কথা। সে কথা সত্যিই অমৃত। ব্রহ্মানন্দরূপী অমৃত। ত্রিতাপজ্বালায় সন্তপ্ত আমাদের জীবনদানকারী অমৃত। শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি কবিরা স্তুতি করছেন তাঁর কথারূপী অমৃতকে। আমাদের নিত্যকার সকল কলুষ, কল্মষ, পাপ—তাঁর কথামৃতের কৃপার দ্বারা হোক দূরীভূত, বিনষ্ট। তাঁর প্রেমসম্পত্তিযুক্ত কথামৃতে যেন আমরা, তাঁর সকল চরণাশ্রিতজনেরা সদাসর্বদা একনিষ্ঠ থাকতে পারি। তাঁর নিত্য আশীর্বাদে, দুর্লভ কৃষ্ণপাদপদ্মে যেন আমাদের দিবানিশি মতি থাকে। তাঁর শ্রীচরণে জানাই আমার কোটি-কোটি অযুত-নিযুত প্রণাম। কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানাই তাঁর শ্রীচরণের কৃপা যেন আমার ও আমার সকল গুরুভাইবোনেদের মস্তকে আমৃত্যু গচ্ছিত থাকে। আর তাঁর কৃপাশীর্বাদে, বৃথা কাজে সময় ও আয়ু নষ্ট না করে সমস্ত পরমায়ুটাই চোখের জলরূপে বের করে শ্রীহরিপাদপদ্মে সমর্পিত করতে পারি। জয় শ্রীহরি। জয় শ্রীগুরু। জয় শ্রীনিতাই।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

—শ্রী চিত্তরঞ্জন রায়

"আমরা ভক্তির আলো জ্বালি কৃষ্ণপাদপদ্ম পাবার জন্য। সেই আলোকেই আত্মজ্ঞান অনুগত রূপে পাই।" —কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সময়টা ১৯৪২ ; তখন যুদ্ধের সময়। বোমা খাওয়ার ভয়ে কোলকাতা ত্যাগ করে আমরা শ্রীধাম নবদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছি। সেই প্রথম কোলকাতা ছেড়ে বাইরে যাওয়া। গঙ্গার কাছে হেতমপুর রাজবাড়ীতে আমরা থাকি। ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গে--কে যেন গেয়ে যায়—"প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরিবোল।" শ্রীকৃষ্ণ নামে কত শক্তি, কত মধু তখন বিচারের বয়স ছিল না। ভোরে সেই হরিনাম শুনে খুব ভাল লাগত। কেন? জানি না। আজও জানি না হরিনামে কেন চোখের জল সামলান যায় না।

বাড়ীর সামনে ছিল ঠাকুরবাড়ী, সকাল সন্ধ্যায় কীর্তন শুনতে যেতাম। বিশেষ করে সন্ধ্যায় হরির লুট ও বাতাসা কুড়াতে বড় ভাল লাগত। খোল-করতালের সঙ্গে দু'হাত তুলে নাচতে সেকি আনন্দ, 'হরিবোল-হরিবোল' এ-নামে কত শক্তি ; একটুও ক্লান্তি বোধ হয়নি। আজ শরীরের ষাট বৎসর হয়েছে হাঁটতে চলতে আর আগের মত শক্তি নেই—কিন্তু কি আশ্চর্য এখনও হরিবোল বলে নাচার সময় আগের শক্তি ফিরে পাই। এই আশ্রমে ছিলেন ললিতা ও বিশাখা সখীদ্বয়। দেখলে মনে হত রাজস্থানবাসী দুই গোপিনী। পরে জানতে পেরেছিলাম তাঁরা আসলে পুরুষ, 'কান্ত' ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করেন। বড় অবাক লেগেছিল। আর আজ শুধু বুঝি, সেই প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'পুরুষ'—আমরা সবাই যে তার গোপিনী। সন্ধ্যায় আমাদের ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচার পালা শেষ হলে শুরু হত মধুর কীর্তন। গাইতেন শ্রীরামদাস বাবাজী ও খোলে সঙ্গত করতেন শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসী। গান শুনে মোহিত ও আত্মহারা হয়ে পড়তাম। আবার সেই কান্না ও আনন্দ ; কেন জানি না। একদিন সেই সুঠাম-সুদেহ-গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী শ্রীরামদাস বাবাজীকে বড় আপন মনে হল। আবদার করলাম আমাদের বাড়ীতে আসতে হবে। কি-আশ্চর্য উনি এলেন! আমার কি আনন্দ ও গর্ব, একটু অহংকারও হয়েছিল আমার নিমন্ত্রণে উনি এলেন বলে। তখন বোঝবার বয়স ছিল না কত কৃপা তিনি করেছিলেন। চিরকালের জন্য শ্রীহরির নাম লিখে গেলেন আমার মনে। আমরা সবাই সংসারে যেন নেগেটিভ (Negative) হয়ে রয়েছি, হরিনাম যেন পজেটিভ (Positive) কারেন্ট (Current) ; কানে শুনলেই বিদ্যুৎ খেলে। এ যেন বিয়োগ হয়ে থেকে যোগে মিলে যাওয়া।

এরপর বহুকাল হয়ে গেছে। শুধু ৺মা ৺মা বলে দিন কাটে। আমার দিদি (ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী) এসেছেন দিল্লীতে--পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে। ওঁরা শ্রীবৃন্দাবনধামে যাচ্ছিলেন সদল-বলে। আমি দিদির সঙ্গে গিয়েছিলাম ওঁকে দর্শন করতে। দেখলাম ওঁর মাথার কাছে রাখা ওঁর শ্রীগুরুদেবের ছবি—সেই বৈষ্ণব ঠাকুরের, সেই আমার ছেলেবেলায় দেখা শ্রীরামদাস বাবাজী। জানতে পারলাম পণ্ডিতমশাই ওঁর শিষ্য। আনন্দে ও অনুভূতিতে আবার মন ভরে গেল। কি

সুন্দর হাসি—যেন প্রেম বিলাতে এসেছেন। সেই আমার নবদ্বীপে ভোরবেলা শোনা ডাকের মত—"প্রেমদাতা নিতাই বলেন গৌর হরি হরিবোল"। দিদির চিঠিতে জানতে পারলাম উনি সজ্ঞানে অমৃতলোকে চলে গেছেন। শুধু জানতে ইচ্ছা করে "কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে তুমি ধরায় আস।" কত প্রাণেই না উনি ভক্তির প্রদীপ জ্বেলে গেলেন। আমিও এক দীন ভক্ত আমার প্রণাম জানাই সেই মহাপ্রাণের উদ্দেশ্যে।

—শ্রীসমীর মৈত্র, নিউ দিল্লী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রদ্ধেয় শ্রীকেদারনাথ রায় মহাশয় আমাদের শ্রদ্ধার এবং আদরের। কেদার দাদা'র আমি একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। তাঁর সঙ্গে মুখোমুখী পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি বটে, কিন্তু যেখানেই তাঁর ভাগবতপাঠ হত, আমি এবং আমার বাবা সেখানেই উপস্থিত থেকে শ্রীগোবিন্দের লীলা এবং মাধুর্য্যরস আস্বাদন করতাম। তাঁর প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে "গোপীগীত" একটি অনবদ্য সৃষ্টি। গোপীতত্ত্ব এমন সুন্দর, সহজ করে আর কেউ বলতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তাঁর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে আমরা মর্মাহত। তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই এবং শ্রীগোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করি তিনি শ্রদ্ধেয় কেদার দাদাকে তাঁর লীলাসঙ্গী করে নিন।

—দীপ্তি মুখোপাধ্যায়

তত্ত্বদর্শী আমার কেদার দাদা

একদিন প্রশ্ন করলাম—দাদা শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবতের সারমর্ম কি ?

হেসে হেসে বললেন—দেখ, বেদ উপনিষদ পুরাণ প্রভৃতি প্রণয়ন পরে গীতা। সবার শেষে শ্রীমদ্ ভাগবত সর্বশেষ সর্বোত্তম দান। গীতা দর্শন শাস্ত্র অর্থাৎ দৃষ্টি শ্রীমদ্ ভাগবত স্বরূপ দ্রষ্টা। গীতার উৎপত্তি বিষাদ যোগ থেকে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বক্তা ও অর্জুন শ্রোতা, আঠার অধ্যায়ের মধ্যে ছয় ছয় তিনটি ভাগ কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ। কর্ম ও জ্ঞান দুটি নারকেল মালার মত আভরণ বা সম্পুট করে রসাল বা সার ভক্তিযোগ মাঝে রেখেছেন। কারণ নিজে বক্তা, তিনি তো নিজের ভক্তিযোগ প্রাধান্য বলতে পারেন না। ভক্ত ভক্তির মহিমা বা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলবে। ভগবানও বলতে পারেন না তাই গীতার মধ্যে গোপনে ভক্তিতত্ত্ব দিয়ে গেলেন। তার প্রমাণ, যেমন মুদিখানার দোকানে সব মশলার ডিবে থাকে হলুদ লঙ্কা জিরে ইত্যাদি। উপরে লেখা থাকে এর ভিতরে এই আছে। তদ্রূপ গীতার মধ্যে ভক্তিযোগ প্রাধান্য তার হেডিং শ্লোক ১৮।৬৬ গীতা—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তথাপি কর্মযোগ অর্থাৎ সাধন করা প্রয়োজন। সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কভু না মিলয়। কিছু করতে হবে। দ্বিতীয় সাধন করে বস্তু পেলেও হবে না, বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজন। জ্ঞান না থাকলে বস্তু চিনবে কি করে, কর্মযোগ জ্ঞানযোগ প্রয়োজন। তবে এরা সাধন, ভক্তি সাধ্য বস্তু। শ্রীমদ্ ভাগবতবক্তা শুকদেব গোস্বামিপাদ, শ্রোতা পরীক্ষিত মহারাজ। বিষয়বস্তু মুমুক্ষু অবস্থা, শেষ মাত্র সাত দিন পরমায়ু এর মধ্যে শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্ম প্রয়োজন। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবৎ স্বরূপ। তার প্রমাণ পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীমদ্ ভাগবতের ধ্যান—

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ—
তৃতীয়চতুর্থৌ কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো
ভুজান্তরং দোর্যুগলং, তথান্যৌ॥

কণ্ঠস্তু রাজন্ নবমো যস্য ভাতি
মুখারবিন্দং দশমং প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং
শিরো যদ্ দ্বাদশ এব ভাতি॥

তমাদিদেবং পুরুষং প্রধানং
তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসারসমুদ্রসেতুং
ভজামহে ভাগবতস্বরূপম্॥

এই দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবতের মধ্যে মাত্র তিনটি বিষয় বুঝিয়েছেন। শুকদেব গোস্বামিপাদও দুইটি উপদেশ দিয়েছেন। তিনটি বিষয় মানে জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, শ্রীগুরুতত্ত্ব। আগে জীবতত্ত্ব না জানলে, আমি কে না জানলে আমার কি প্রয়োজন কি করে জানবে? আবার সেই প্রয়োজন বস্তু কার দ্বারা প্রাপ্তি সেই বা কি করে বুঝবে? তাই সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে এই প্রশ্ন করেছিলেন—

কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়॥

তাই আগে জানতে হবে আমি কে? দ্বিতীয় আমার কি প্রয়োজন? তৃতীয় সেই প্রয়োজন বস্তু কে দেবে? যখন জানবে আমি জীব অনুচৈতন্য অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য যথা—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥

কেবল তাই নয়, গীতায় আরও বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ (ভাঃ১৫।৭)

তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলে গেল।
তেই কারণে মায়া পিশাচী গলায় বাধিল॥

একমাত্র অনুচৈতন্য জীব বিভু চৈতন্য ভগবানকে পাওয়াই কর্তব্য। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেম-ভক্তি লাভ ভগবতপ্রাপ্তি না হয়েছে ততক্ষণ জন্ম মৃত্যু রহিত হবে না, তখন বিভু চৈতন্য অর্থাৎ অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দর স্বরূপ অনুভব বা জানতে চেষ্টা করবে, যখন জানবে রামাদি।

তখন জানবে অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দই চরম প্রাপ্তি বা সেই রাধাকৃষ্ণ মিলিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ অবতার সার গৌরহরির চরণ বা নিতাই গৌর প্রাপ্তিই চরম প্রাপ্তি, তবে এই মর-জগতে স্থিত মায়া জগৎবাসী জীব নিত্য চিন্ময় ধামস্থিত গৌর গোবিন্দকে পাওয়া বড় কঠিন। কে প্রাপ্তি করিয়ে দেবে, একমাত্র শ্রীগুরুদেব গোবিন্দ নিজ প্রাপ্তির উপায় জানাবার জন্য শ্রীগুরুস্বরূপে প্রকাশ। তাই মহাজন বলেছেন—

জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥

শ্রীমদ্ ভাগবতে নিজ মুখে উক্তি—

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেছেন—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

এই ভাগবতের সার কথা, জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব বোঝা এবং দুইটি উপদেশ বাক্য অনুশীলন, অনুশোচনা অর্থাৎ অনুশীলন করলে ক্রমশঃ একদিন না একদিন ঠিক বস্তু পাবে। বাবাজী মহারাজ বলতেন, চলতে থাক একদিন ঠিক জায়গায় পৌঁছাবে। ঐ অনুশোচনার অর্থ আমি যে কাজ করেছি কেউ জানুক বা না জানুক এ অন্যায়; আমাকে ক্ষমা কর। এই অনুশোচনা বা অনুতাপ, বাবাজী মহারাজ বলতেন, চাই ব্যাকুলতা। তাকে ডাকতে হবে না আগে হৃদয় পরিষ্কার কর। ঘর পরিষ্কার করতে দুইটি বস্তু লাগে ঝাড়ু ও জল। ব্যাকুলতা ঝাড়ু, চোখের জলই জল। তাহলে কৃপা বা বস্তু লাভ হবে। আজ এইসব গূঢ় তত্ত্ববস্তুসন্ধান শাস্ত্রসিদ্ধান্ত দিয়ে বোঝানোর লোক হারালাম। আর কি লিখি যেন শ্রীগুরু পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে বিকাতে পারি। শেষ জীবনে জয়গুরু রাম বলে যেন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করি।

—শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র
ভূতপূর্ব খাদ্যমন্ত্রী, নিউ ক্যাপিটাল, ভুবনেশ্বর।

আমায় যদি রাধারাণী তার ঝাড়ুদার করেন,
তাহলে কৃষ্ণ আমার খোসামোদ করবে।

—শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী

স্মৃতীতর্পণ

কেদারদাকে শেষ দেখেছি মাস কয়েক আগে পানিহাটিতে এক ভক্তের বাড়ীতে। বেশ কিছুদিন থেকেই ওনার শরীর ভাল যাচ্ছিল না তা জানতুম, কিন্তু ওঁকে দেখে তা অনুমান করা যেত না কোনোদিন। সম্ভবত শারীরিক অসুস্থতা ওঁর মনকে স্পর্শ করতে পারত না, তাই মুখে চোখে তার কোনো ছায়া কোনোদিন আমার চোখে পড়েনি, বরং অন্তরের সুধা মাখা ভাবটিই ওঁর মুখাবয়বে প্রকাশ পেতে দেখতুম।

ভক্ত সমাগম থেকে তফাতে, একান্তে, একটা ঘরে জনাকয়েক ভক্ত পরিবৃত হয়ে কেদারদা বসেছিলেন একটা খাটের ওপর। দেখলুম যতবারই ওঁকে দেখেছি, যেমন ভাবে বসে থাকতে দেখেছি, তেমনই সহজভাবে বসে আছেন। একটি প্রশান্ত মাধুর্য ওঁকে ঘিরে রয়েছে। ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম জানিয়ে এক কোণে বসলুম। মনে মনে একটু আশা ছিল যদি ভগবৎ প্রসঙ্গ কিছু হয় তবে শোনা যাবে; কিন্তু সম্ভবতঃ শরীরের কারণেই কারুর সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা বলছিলেন না। আমিও স্বল্পক্ষণ বসে পুনরায় প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সেই আমার শেষ দেখা কেদারদাকে। সাক্ষাতে সেই আমার শেষ প্রণাম।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলি-ধন্য পাঠবাড়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব বেশীদিনের নয়। তবে অল্পদিনের হলেও, শুধু বাইরের নয়, অন্তরের গভীরে তা সুবিস্তৃত। আজ মনে পড়ে, এই পরিচয়ের সূচনাটি যেন বৈষ্ণবীয় রীতিতেই ঘটেছিল। বরানগর পাঠবাড়ীর কথা আমি প্রথম শুনেছিলুম আমার বন্ধুবর সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া প্রয়াত শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। শোনামাত্র ভেতর থেকে যে একটা আকর্ষণ অনুভব করেছিলুম সে কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। 'কেদার'দা এই নামটিও পাঠবাড়ীর কথাপ্রসঙ্গে আমি প্রথম শুনি কানাইদার মুখেই। যাই হোক, অনেকবার কথা হলেও শেষপর্যন্ত কানাইদার সঙ্গে পাঠবাড়ীতে যাওয়া আমার ঘটে ওঠে নি। অনেক বছর পরে সত্যিই একদিন পাঠবাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ এলো, কিন্তু সে একেবারেই অন্য সূত্রে। আমার একান্ত সুহৃদ প্রদ্যোত (শ্রীপ্রদ্যোত কুমার ভদ্র) একদিন আমাকে টেলিফোনে বলল —'সামনের রবিবার আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে? আমি আগে একবার গিয়েছিলুম, খুব ভাল লেগেছে। সেবার অপূর্ব সুন্দর আরতি দেখেছিলুম। তখনি তোমার কথা মনে হয়েছিল, কারণ—আমি জানি তোমার সেখানে গেলে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।' বললুম—কোথায়?' প্রদ্যোত বলল—বরানগর পাঠবাড়ীতে। সামনের রবিবার উৎসব আছে। চৌষট্টি মোহান্তর ভোগ আর আরতি সত্যিই এক দেখবার জিনিষ।

'পাঠবাড়ী', 'চৌষট্টি মোহান্ত'—শব্দগুলো আমাকে ভেতরে ভেতরে তীব্রভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। প্রদ্যোতকে সে সব কথা কিছু না বলে শুধু বললুম—"যাব।"

বরানগরের ঘন বসতিপূর্ণ অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে অতঃপর আরো একটি সরু গলিপথ অবশেষে পাঠবাড়ির বহিঃফটকে হাজির হলুম। ভেতরে প্রবেশ করতেই আবিষ্কার করলুম যে-সব পল্লী পার হয়ে এলুম তার সঙ্গে এখানকার কোন মিল নেই। এ এক ভিন্ন জগৎ। এখানকার সব কিছু আলাদা—এখানকার হাওয়া আলাদা, এখানে যে সব মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা যেন অন্য ধরণের। সব মিলিয়ে একটি আনন্দময় পরিবেশ। ভাব-ভক্তি-ভালবাসা এখানে যেন বড় সহজ হয়ে ফুটে রয়েছে। ঘুরে ঘুরে সব দেখছি। এখানকার ভাব আমার মনেও এসে দোলা দিচ্ছে। একটি ভাল লাগার ছোঁওয়া মনকে ঘিরে রয়েছে। সংসারের সব মলিনতা গায়ে মেখেও গঙ্গায় ডুব দিলেই মানুষ যেমন পবিত্র হয়ে ওঠে এও যেন তেমনি। এখানকার হাওয়া গায়ে মেখে নিজেকেও কেমন যেন পবিত্র বলে অনুভব হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতীক্ষিত চৌষট্টি মোহান্তর ভোগারতি দেখার সৌভাগ্য হল। ইতিপূর্বে এ জিনিষ কখনও দেখিনি। সত্যিই এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। চারিপাশে তাকিয়ে দেখি ততক্ষণে বেশ ভিড় জমেছে। প্রদ্যোতের বন্ধু লাটু (শ্রীদিলীপ কুমার বসু) গোড়া থেকেই আমাদের তদারকিতে ছিল। ভিড় ঠেলে পথ করে আমাদের নাটমন্দিরের বাইরে নিয়ে এসে ও বলল—আপাততঃ সবাই ব্যস্ত। প্রসাদ পেতেও কিছুটা দেরী হবে। আমার মনে হয় আপনারা চলুন জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করুন ভাল লাগবে আর ওখানেই বসুন, সময়মত আমি ডেকে নেব। লাটুর ওই প্রস্তাব প্রদ্যোতেরও মনোমত হ'ল। বাঁধানো উঠোন পেরিয়ে ডানদিকের একটি ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে লাটু চলে গেল। এটাই জ্যাঠামশাই-এর ঘর। ভেতরে পা রাখতেই চোখে পড়ল একপাশে শয্যার ওপর বসে আছেন গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন এক পবিত্রমূর্তি। বয়স অনুমান সত্তরের কাছাকাছি। ইনিই নিশ্চয়ই জ্যাঠামশাই। প্রদ্যোত ভেতরে প্রবেশ করে আমাদের সঙ্গে একে একে জ্যাঠা-মশাই এর পরিচয় করিয়ে দিল। 'কেদারদা—এই আমার বন্ধু.........' ইত্যাদি। আমার অনভ্যস্ত কানে প্রথমটা কেমন যেন লাগলো এই প্রবীণ সাধু মানুষটিকে প্রদ্যোত দাদা বলে সম্বোধন করাতে। পরে অবশ্য জানলুম সাধারণভাবে এখানে এটাই রীতি এবং তখন বেশ ভালই লাগল এই সহজ সম্পর্কের কাছের ডাকটি। পরে আরও জানলুম—লাটুর মত যারা মদনদার আশ্রিত তারা মদনদাকে বাবা বলে এবং কেদারদাকে জ্যাঠামশাই বলে থাকে।

প্রসন্ন মধুর হাসিতে কেদারদা আমাদের আপ্যায়ন করে বসতে বললেন। আমরা ভূমি-স্পর্শ করে প্রণাম জানিয়ে একপাশে জায়গা করে নিয়ে বসলুম। ঘরখানি যদিও ভক্তবৃন্দে পূর্ণ তবু শয্যায় উপবিষ্ট ওই মানুষটির স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বই ঘরের সবখানটি জুড়ে রয়েছে—বেশ অনুভব হতে লাগলো। কেদারদাকে এই আমার প্রথম দর্শন।

কেদারদার ভাগবত পাঠের সৌন্দর্যের কথা প্রদ্যোতের কাছে অনেকবার শুনেছি। তার কিছুটা অভিজ্ঞতা আমার হল সে বছরই রথের সময় পুরীতে। ঝাঁঝপিটা মঠে কেদার-দার পাঠের

বিষয় ছিল রথের সময় গৌড় থেকে ভক্তবৃন্দের নীলাচলে আগমন। সেদিন কেদারদার পাঠ ও ব্যাখ্যা থেকে আমার কাছে যে কথাটি পরিকার হয়ে গিয়েছিল তা আজও মনে আছে—মহাপ্রভু তখন নীলাচলে অধিষ্ঠান করছেন। গৌড় থেকে ভক্তরা প্রতিবছরই রথের সময় পুরীতে আসতেন কিন্তু রথযাত্রা দর্শন ছিল উপলক্ষ্যমাত্র। তাঁদের লক্ষ্য ছিল মহাপ্রভুর দর্শন ও মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের আনন্দ। আমি সেবার রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ছবি তুলতে গিয়েছিলুম। পাঠরত কেদারদারও ছবি তুললুম। সকলের অলক্ষ্যে তাঁর পাঠের কিছুটা অংশ টেপরেকর্ডারে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। পাঠবাড়ীর মানুষজনের সঙ্গে তখনও আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠেনি।

এরপর পাঠবাড়ীতে অনেকবার যাবার সুযোগ হয়েছে। এই সুযোগে আমার আরও অনেক বন্ধুবান্ধবের পাঠবাড়ীর ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে নানা উৎসবে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছে। যখনই গেছি প্রতিবারই কেদারদার ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে কিছুক্ষণ বসে এসেছি। একবার কেবল গিয়েছিলুম কেদারদার কাছেই কিছু বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে।

বন্ধুবর সঞ্জীব (শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়)-এর কাছ থেকে একটা হুকুমনামা পেয়ে সেবার দেশ-পত্রিকার জন্যে রথযাত্রা সম্পর্কে একটা লেখা তৈরী করছিলুম। লেখার মাঝখানে একটা জায়গায় গিয়ে একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লুম। জগন্নাথের শ্রীমূর্তিকে মহাপ্রভু কি চোখে দেখতেন, রথের সময় তাঁর কি বিশেষ ভাব হত তার কাহিনী এবং তত্ত্বগুলি আমার কিছু কিছু পড়ে এবং অনেকটাই পুরীর রাধাকান্ত মঠের পণ্ডিত (শ্রীহেমাঙ্গ দাস শাস্ত্রী) মশাই-এর কাছ থেকে শুনে জানা ছিল। তবু লিখে ফেলার আগে একবার কেদারদার কাছে চলে গেলুম। ঘরে গিয়ে প্রণাম করে বসে মনের অভিলাষ ব্যক্ত করলুম। মনে একটু দ্বিধা ছিল—ওঁকে শারীরিক দিক থেকে হয়ত উৎপীড়ন করা হবে। তবু খোলাখুলি বললুম আমার এই জন্যেই আজ আসা। সঙ্গে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার ছিল। আশ্চর্য দেখলুম শারীরিক কোন কষ্টকে উনি গ্রাহ্যই করলেন না। আমি যে মহাপ্রভুর ও শ্রীজগন্নাথমূর্তি সম্পর্কে যথার্থ জানতে আগ্রহী—এতেই তিনি মহাখুশী। সোজা হয়ে বসে তখুনি শুরু করে দিলেন। কথা বলতে বলতে যেন মুখখানা ক্রমে ভাবে উদ্ভাসিত উঠতে লাগল। মহানন্দে আত্মমগ্ন হয়ে বলে চললেন। সেদিন ওঁর কথা শোনা ছাড়াও ওই অবস্থায় কেদারদাকে দেখার সৌভাগ্যও আমার সেদিনকার পরম প্রাপ্তি।

আজ বাইরে থেকে ভাবগততনু কেদারদা আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছেন সত্য, কিন্তু বোধ হয় এর থেকেও সত্য হৃদয়ের গভীরে কেদারদার উপস্থিতি। অনুভব তার আমাদের ভাবে, ভক্তিতে, আমাদের ভাগবতী প্রেরণায়।

আজকের এই স্মৃতি তর্পণ—আমার তাঁকে অন্তরের প্রণাম নিবেদন।

—ডাঃ বারীণ রায়

GURUJI

It was one of those coincidences which can only have a divine genesis. It is was in early '87, I wasn't yet married and had no such plans either. But my parents without my knowing had called my wife and her parents to Delhi. The meeting went of very well and already half my mind was tilting towards a 'yes' for marriage. The next day mummy got Guruji to our house. He entered the door and said "This is Gunja's (my wife) house." That was a day I can never forgot. Because it was Guruji's presence in our house that somehow tillted the scale for my agreeing for this marriage. Since then I have never taken an important descision without telling Guruji. Mostly it was only in my mind because I stay in Delhi.

Since my marriage mummy & my wife were often asking me to take Diksha. But somehow I never got down to taking it. It was last year, Guruji had come to Delhi and we had gone to the station to receive him ; At the platforms itself my wife asked me if I would take Diksha from Guruji. I agreed and the very next day I was truly his disciple.

Guruji had said that whenever you face a problem, a task which elludes solution think of "Sri Radharaman" and thats exactly what I do, and somehow even the most complicated jigsaw puzzle falls into place. All problems fall aside and life becomes a smooth and joyous journey.

Gurujis discarding of his earthly garb was an occasion of great shock & profound grief. But at the same time one can have the satisfaction and comfort of the knowledge that he will always be with us albeit invisible but definitely their to guide us and show the correct path to take.

The only one disappointment I have is that our son Dhruv who was born with Guruji's blessings and surely had favourite place for himself in

Guruji's heart will not be able to eat his first 'Anno' from Guruji's hands & thereafter get Diksha from him.

Allthough I know that his blessings will always be with us, yet his physical absence and soothing words will always leave a void in our life, which can only be filled when we, if we are fortunate, join him where he is now.

—**V. S. Chauhan**

শ্রদ্ধাঞ্জলি

এই দিব্যভূমি ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল হতে কত মহান ভাগবতপুরুষ আবির্ভূত হয়ে সাধারণ সংসারী মানুষকে দিব্য অমৃতময় জীবনের পথ নির্দেশ করেছেন এবং শাশ্বত ভাগবত ভক্তির প্রেমরস সঞ্চার করে ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে জীব জীবনের লক্ষ্য মুক্তি—যা লাভ হয় ভগবৎ প্রাপ্তিতে, সেইদিকে পরিচালিত করেছেন। এমন এক মহান ভাগবতীপুরুষ ছিলেন বিদেহমুক্ত শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ। যাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবতীকথা আপামর সাধারণ মানুষকে ভক্তি ভাগীরথীর প্রেমপ্রবাহে অবগাহন করাতো, তাঁর দিব্য প্রেমময় মধুর বাণী আজও স্মরণ মাত্রেই কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়, এবং বাবাজী মহারাজের প্রেমভক্তির মিলিত তনু যাহা দিব্য জ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল স্মরণ মাত্রেই হৃদয়পটে প্রকাশিত হয়। যাঁর অভাব ভাগবতজনেরা অনুভব করে প্রেমাশ্রু নিবেদন করছেন, তাঁর অভাব পূরণ হওয়া প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। পাঠবাড়ী আশ্রমের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। ভোলাগিরি আশ্রমের সহিত পাঠবাড়ী আশ্রমের এক বিশেষ আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা আছে, যার মধ্যমণিরূপে ছিলেন ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মলীন স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি মহারাজ। কত মহাপুরুষ ভারতের অধ্যাত্ম আকাশ উজ্জ্বল করে রেখেছেন। সেই অধ্যাত্ম আকাশে আরও একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যুক্ত হল। সেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আভা অনন্তকাল ধরে প্রকাশিত থাকবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক আকাশে। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের বিদেহ আত্মার প্রতি সমগ্র ভোলানন্দ পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছি।

স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী

মহামণ্ডলেশ্বর, ভোলাগিরি সন্ন্যাস আশ্রম, হরিদ্বার

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৬	শ্রীমদ্ভাগবদ্	শ্রীমদ্ভাগবত
৫	১৮	ভাগবৎ	ভাগবত
৮	৫	আগামী	আগমনী
১৩	১৬	সর্বতত্ত্ব	সর্বতত্ত্ব
১৭	১৮	স্থায়ীভাবে	স্থায়িভাবে
৩১	৭	লম	মলম
৪৪	১৮	বাবেন	যাবেন
৬৯	১১	ভূবঃ	ভুবঃ
৭৪	২০	সত্ব	সত্ত্ব
৮২	৮	চিন্ময়	চিন্ময়
৮৮	৪	গ্লাবমন্থেত	প্লাবমন্তেত